প্রথম অধ্যায়

রবীন্দ্রভাবনায় প্রকৃতি

রবীন্দ্রনাথের নিজের লেখা দিয়েই আলোচনাটি শুরু করা যাক। কবি লিখছেন :

১) "যে মৃৎশিল্পিকার আমাকে বানিয়ে তুলেছেন, তাঁর হাতের প্রথম কাজ বাংলাদেশের মাটি দিয়ে তৈরি। একটা চেহারার প্রথম আদল দেখা দিল। সেটাকেই বলি ছেলেবেলা, সেটাতে মিশোল বেশি নেই। তার মাল-মসলা নিজের মধ্যেই জমা ছিল, আর কিছু-কিছু ছিল ঘরের হাওয়া আর ঘরের লোকের হাতে। অনেক সময়ে এইখানেই গড়নের কাজ থেমে যায়। এর উপরে লেখাপড়া-শিক্ষার কারখানা-ঘরে যাদের বিশেষরকম গড়ণ-পিটন ঘটে, তারা বাজারে বিশেষ মার্কার দাম পায়।

আমি দৈবক্রমে ঐ কারখানা ঘরের প্রায় সমস্তটাই এড়িয়ে গিয়েছিলুম।" [১]

২) " আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়। শহরে শ্যাক্‌রাগাড়ি ছুটছে তখন ছড়্ ছড়্ করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বের-করা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটর-গাড়ি। তখন কাজের এত বেশি হাঁস্‌ফাঁসানি ছিল না, রয়ে বসে দিন চলত।" [২]

৩) "তখন রাস্তার ধারে ধারে বাঁধানো নালা দিয়ে জোয়ারের সময় গঙ্গার জল আসত। ঠাকুরদার আমল থেকে সেই নালার জলের বরাদ্দ ছিল আমাদের পুকুরে। যখন কপাট টেনে নেওয়া হত, ঝর্‌ঝর্ কল্ কল্ করে ঝরণার মতো জল ফেনিয়ে পড়ত।

---

১. রবীন্দ্ররচনাবলী জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, দশম খন্ড প্রবন্ধ, ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৮, ছেলেবেলা, ১৪ নং প্রবন্ধ - পৃ.স.১৬১

২. তদেব, ছেলেবেলা, ১ নং প্রবন্ধ - পৃ.স.১৩১

মাছগুলো উল্টো দিকে সাঁতার কাটবার কসরত দেখাতে চাইত। দক্ষিণের বারান্দার রেলিঙ ধরে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতুম। শেষকালে এল সেই পুকুরের কাল ঘনিয়ে, পড়ল তার মধ্যে গাড়ি গাড়ি রাবিশ। পুকুরটা বুজে যেতেই পাড়া-গাঁয়ের সবুজ ছায়া-পড়া আয়নাটা যেন গেল সরে। সেই বাদাম গাছটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু অমন পা ফাঁক করে দাঁড়াবার সুবিধে থাকতেও সেই বৃহদাকার ঠিকানা আর পাওয়া যায় না।

ভিতরে বাইরে আলো বেড়ে গেছে।" [৩]

৪) " আমার জীবনে বাইরের খোলা ছাদ ছিল প্রধান ছুটির দেশ। ছোটো থেকে বয়স পর্যন্ত আমার নানা রকমের দিন এই ছাদে নানা ভাবে বয়ে চলেছে। আমার পিতা যখন বাড়ি থাকতেন তাঁর জায়গা ছিল তেতালার ঘরে। চিলেকোঠার আড়ালে দাঁড়িয়ে দূর থেকে কত দিন দেখেছি, তখনও সূর্য ওঠেনি, তিনি সাদা পাথরের মূর্তির মতো ছাদে চুপ করে বসে আছেন, কোলে দুটি হাত জোড়-করা। মাঝে মাঝে তিনি অনেকদিনের জন্যে চলে যেতেন পাহাড়ে পর্বতে, তখন ওই ছাদে যাওয়া ছিল আমার সমুদ্দুর-পারে যাওয়ার আনন্দ। চিরদিনের নিচে তলায় বারান্দায় বসে বসে রেলিঙের ফাঁক দিয়ে দেখে এসেছি রাস্তার লোক-চলাচল, কিন্তু ঐ ছাদের উপর যাওয়া লোক-বসতির পিল্‌পেগাড়ি পেরিয়ে যাওয়া। ওখানে গেলে কলকাতার মাথার উপর দিয়ে পা ফেলে ফেলে মন চলে যায় - সেখানে আকাশের শেষ নীল মিশে গেছে পৃথিবীর শেষ সবুজে। নানা বাড়ির নানা গড়নের উঁচুনিচু ছাদ চোখে ঠেকে, মধ্যে মধ্যে দেখা যায় গাছের ঝাঁকড়া মাথা। আমি লুকিয়ে ছাদে উঠতুম প্রায়ই দুপুর বেলায়। বরাবর এই দুপুর বেলাটা নিয়েছে আমার

---

৩. তদেব, ছেলেবেলা - ১ নং প্রবন্ধ - পৃ.স. ১৩২

মন ভুলিয়ে। ও যেন দিনের বেলাকার রাত্তির, বালক সন্ন্যাসীর বিবাগী হয়ে যাবার সময়।" [৪]

ওপরের উদ্ধৃত অংশগুলি 'ছেলেবেলা' থেকে নেওয়া। যার মধ্যে কবি তাঁর জীবনের পারিবারিক ও প্রাথমিক পরিবেশের কথা বলেছেন।

অতঃপর স্মরণ করা যাক্ 'জীবনস্মৃতি' থেকে প্রাসঙ্গিক নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি—

ক) জানালার নিচেই ঘাটবাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট - দক্ষিণধারে নারিকেল শ্রেণী। গন্ডিবন্ধনের বন্দী আমি জানালার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্ত দিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মতো দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম। সকাল হইতে দেখিতাম, প্রতিবেশীরা একে একে স্নান করিতে আসিতেছে। তাহাদের কে কখন আসিবে আমার জানা ছিল। প্রত্যেকের স্নানের বিশেষত্বটুকুও আমার পরিচিত। কেহ-বা দুই কানে আঙ্গুল চাপিয়া ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া দ্রুতবেগে কতকগুলি ডুব পাড়িয়া চলিয়া যাইত, কেহ-বা ডুব না দিয়া গামছায় জল তুলিয়া ঘন ঘন মাথায় ঢালিতে থাকিত, কেহ-বা জলের উপরিভাগের মলিনতা এড়াইবার জন্যে বার বার দুই হাতে জল কাটাইয়া লইয়া হঠাৎ একসময়ে ধাঁ করিয়া ডুব পাড়িত, কেহ-বা উপরের সিঁড়ি হইতেই বিনা ভূমিকায় সশব্দে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া আত্মসমর্পন করিত, কেহ-বা জলের মধ্যে নামিতে নামিতে এক নিশ্বাসে কতকগুলি শ্লোক আওড়াইয়া লইত, কেহ-বা ব্যস্ত, কোনো স্নান সারিয়া লইয়া বাড়ি যাইবার জন্য উৎসুক; কাহারো-বা ব্যস্ততার লেশমাত্র নাই - ধীরে সুস্থে স্নান করিয়া, জপ করিয়া, গা মুছিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, কোঁচাটা দুই-তিনবার ঝাড়িয়া, বাগান হইতে

---

৪. তদেব, ছেলেবেলা - ৮ নং প্রবন্ধ - পৃ.স. ১৪৮

কিছু বা ফুল তুলিয়া, মৃদুমন্দ-দোদুল-গতিতে স্নানস্নিগ্ধ শরীরের আরামটিকে বায়ুতে বিকীর্ণ করিতে করিতে বাড়ির দিকে তাহার যাত্রা। এমনি করিয়া দুপুর বাজিয়া যায়, বেলা একটা হয়। ক্রমে পুকুরের ঘাট জনশূণ্য, নিস্তব্ধ। কেবল রাজ-হাঁস ও পাতিহাঁসগুলা সারাবেলা ডুব দিয়া গুগলি তুলিয়া খায় এবং চঞ্চু-চালনা করিয়া ব্যতিব্যস্তভাবে পিঠের পালক সাফ করিতে থাকে।

পুষ্করিনী নির্জন হইয়া গেলে সেই বটগাছের তলাটা আমার সমস্ত মনকে অধিকার করিয়া লইত। তাহার গুঁড়ির চারিধারে অনেকগুলা ঝুরি নামিয়া একটা অন্ধকারময় জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই কুহকের মধ্যে, বিশ্বের সেই একটা অস্পষ্ট কোণে যেন ভ্রমক্রমে বিশ্বের নিয়ম ঠেকিয়া গেছে। দৈবাৎ সেখানে যেন সুপ্তযুগের একটা অসম্ভবের রাজত্ব বিধাতার চোখ এড়াইয়া আজও দিনের আলোর মাঝখানে রহিয়া গিয়াছে। মনের চক্ষে সেখানে যে কাহাদের দেখিতাম এবং তাহাদের ক্রিয়াকলাপ যে কী রকম, আজ তাহা স্পষ্ট ভাষায় বলা অসম্ভব।" [৫]

খ) "বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন-কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দ্বার-জানালার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এদিক-ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন গরাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ - মিলনের উপায় ছিল না, সেই জন্য প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল প্রবল, আজ সেই খড়ির গন্ডি মুছিয়া গেছে, কিন্তু গন্ডি তবু ঘোচে নাই। দূর এখনো দূরে, বাহির এখনো বাহিরেই।" [৬]

---

৫. তদেব, জীবনস্মৃতি - ঘর ও বাহির, পৃ.স.১০
৬. তদেব, জীবনস্মৃতি - ঘর ও বাহির, পৃ.স.১১

গ) " এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন্ পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে করিয়া লইল। সেখানে চাকরদের ঘরটির সামনে গোটা কয়েক পেয়ারা গাছ। সেই ছায়াতলে বারান্দায় বসিয়া সেই পেয়ারা বনের অন্তরাল দিয়া গঙ্গার ধারার দিকে বাহিয়া আমার দিন কাটিত। প্রত্যহ প্রভাতে ঘুম হইতে উঠিবামাত্র আমার কেমন মনে হইত, যেন দিনটাকে একখানি সোনালি - পাড় দেওয়া নূতন চিঠির মতো পাইলাম। লেফাফা খুলিয়া ফেলিলে যেন কী অপূর্ব খবর পাওয়া যাইবে। পাছে একটুও কিছু লোকসান হয় এই আগ্রহে তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া বাহিরে আসিয়া চৌকি লইয়া বসিতাম। প্রতিদিন গঙ্গার উপর সেই জোয়ার-ভাঁটার আসা-যাওয়া, সেই কত রকম-রকম নৌকার কত গতিভঙ্গি, সেই পেয়ারা গাছের ছায়ার পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে অপসারণ, সেই কোন্‌নগরের পারে শ্রেণীবদ্ধ বনান্ধকারের উপর বিদীর্ণবক্ষ পূর্বাস্তকালের অজস্র স্বর্ণশোণিতপ্লাবণ। এক-একদিন সকাল হইতে মেঘ করিয়া আসে, ওপারের গাছগুলি কালো, নদীর উপর কালো ছায়া; দেখিতে দেখিতে সশব্দ বৃষ্টির ধারায় দিগন্ত ঝাপসা হইয়া যায়, ওপারের তটরেখা যেন চোখের জলে বিদায় গ্রহণ করে; নদী ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে এবং ভিজা হাওয়া এপারের ডালপালাগুলার মধ্যে যা-খুশি-তাই করিয়া বেড়ায়।

কড়ি-বরগা-দেওয়ালের জঠরের মধ্য হইতে বাহিরের জগতে যেন নূতন জন্মলাভ করিলাম। সকল জিনিসকেই আর-একবার নূতন করিয়া জানিতে গিয়া, পৃথিবীর উপর হইতে অভ্যাসের তুচ্ছতার আবরণ একেবারে ঘুচিয়া গেল। সকাল-বেলায় এখোগুড় দিয়া যে বাসি লুচি খাইতাম, নিশ্চয়ই স্বর্গলোকে ইন্দ্র যে-অমৃত খাইয়া থাকেন তাহার সঙ্গে তার স্বাদের বিশেষ কিছু পার্থক্য নাই। কারণ, অমৃত জিনিষটা রসের মধ্যে নাই, রসবোধের মধ্যেই আছে - এইজন্য যাহারা সেটাকে খোঁজে তাহারা সেটাকে পায়ই না।

যেখানে আমরা বসিতাম তাহার পিছনে প্রাচীর দিয়া ঘেরা ঘাট-বাঁধানো একটা খিড়কির পুকুর - ঘাটের পাশেই একটা মস্ত জামরুল গাছ, চারিধারেই বড়ো বড়ো ফলের গাছ ঘন হইয়া দাঁড়াইয়া ছায়ার আড়ালে পুষ্করিণীটির আবরু রচনা করিয়া আছে। এই ঢাকা, ঘেরা, ছায়া-করা, সংকুচিত একটুখানি খিড়কির বাগানের ঘোমটা-পরা সৌন্দর্য আমার কাছে ভারি মনোহর ছিল। সম্মুখের উদার গঙ্গা তীরের সঙ্গে এর কতই তফাত। এ যেন ঘরের বধূ। কোণের আড়ালে, নিজের হাতের লতা-পাতা-আঁকা সবুজ রঙের কাঁথাটি মেলিয়া দিয়া মধ্যাহ্নের নিভৃত অবকাশে মনের কথাটিকে মৃদুগুঞ্জনে ব্যক্ত করিতেছে। সেই মধ্যাহ্নেই অনেকদিন জামরুল গাছের ছায়ায়, ঘাটে একলা বসিয়া পুকুরের গভীর তলাটার মধ্যে যক্ষ-পুরীর ভয়ের রাজ্য কল্পনা করিয়াছি।

বাংলাদেশের পাড়াগাঁটাকে ভালো করিয়া দেখিবার জন্য অনেকদিন হইতে মনে আমার ঔৎসুক্য ছিল। গ্রামের ঘরবস্তি চণ্ডীমণ্ডপ রাস্তাঘাট খেলাধুলা হাটমাঠ জীবনযাত্রার কল্পনা আমার হৃদয়কে অত্যন্ত টানিত। সেই পাড়াগাঁ এই গঙ্গাতীরের বাগানের ঠিক একেবারে পশ্চাতেই ছিল - কিন্তু সেখানে আমাদের যাওয়া নিষেধ। আমরা বাহিরে আসিয়াছি কিন্তু স্বাধীনতা পাই নাই। ছিলাম খাঁচায়, এখন বসিয়াছি দাঁড়ে - পায়ের শিকল কাটিল না।" [৭]

" আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পূর্ণ-বিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো-বা ঘন-ঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়মযন্ত্র-যোগে বিদ্যাপতির 'ভরাবাদর মাহভাদর' পদটিতে মনের মতো সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিনী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাত মুখরিত

---

৭. তদেব, জীবনস্মৃতি - বাহিরে যাত্রা, পৃ.স. ২৪-২৫

জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম, কখনো-বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম, জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন, আমি গান গাহিতাম; পূরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পৌঁছিতাম তখন পশ্চিমতটের আকাশে সোনার খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ব বনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত। আমরা যখন বাগানের ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া নদীতীরের ছাদটার উপরে বিছানা করিয়া বসিতাম তখন জলে স্থলে শুভ্র শান্তি, নদীতে নৌকা প্রায় নাই, তীরের বনরেখা অন্ধকারে নিবিড়, নদীর তরঙ্গহীন প্রবাহের উপর আলো ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে।"[৮]

" একদিন সকালে বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমি সেইদিকে চাহিলাম। তখন সেই গাছগুলির পল্লবান্তরাল হইতে সূর্যোদয় হইতেছিল। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ এক মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের উপর হইতে যেন একটা পর্দা সরিয়া গেল। দেখিলাম, একটি অপরূপ মহিমায় বিশ্বসংসার সমাচ্ছন্ন, আনন্দে এবং সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরঙ্গিত। আমার হৃদয়ে স্তরে স্তরে যে একটা বিষাদের আচ্ছাদন ছিল তাহা এক নিমেষেই ভেদ করিয়া আমার সমস্ত ভিতরটাতে বিশ্বের আলোক একেবারে বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। সেইদিনই 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি নির্ঝরের মতোই যেন উৎসারিত হইয়া বহিয়া চলিল। লেখা শেষ হইয়া গেল, কিন্তু জগতের সেই আনন্দরূপের উপর তখনো যবনিকা পড়িয়া গেল না। এমনি হইল আমার কাছে তখন কেহই এবং কিছুই অপ্রিয় রহিল না।" [৯]

"এতদিন জগৎকে কেবল বাহিরের দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিয়াছি, এই জন্যে তাহার একটা সমগ্র আনন্দরূপ দেখিতে পাই নাই। একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন

---

৮. তদেব - জীবনস্মৃতি - গঙ্গাতীর, পৃ.স. ৯৬
৯. তদেব - জীবনস্মৃতি - প্রভাতসঙ্গীত পৃ.স. ১০০

একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোকরশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল তখন সেই জগৎকে আর কেবল ঘটনাপুঞ্জ ও বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়া করিয়া দেখিলাম। ইহা হইতেই একটা অনুভূতি আমার মনের মধ্যে আসিয়াছিল যে, অন্তরের কোন্ একটি গভীরতম গুহা হইতে সুরের ধারা আসিয়া দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে - এবং প্রতিধ্বনি-রূপে সমস্ত দেশকাল হইতে প্রত্যাহত হইয়া সেইখানেই আনন্দস্রোতে ফিরিয়া যাইতেছে। সেই অসীমের দিকে ফেরার মুখের প্রতিধ্বনিই আমাদের মনকে সৌন্দর্যে ব্যাকুল করে। গুণী যখন পূর্ণহৃদয়ের উৎস হইতে গান ছাড়িয়া যেন তখন সে এক দ্বিগুণতর আনন্দ। বিশ্বকবির কাব্যগান যখন আনন্দময় হইয়া তাঁহারই চিত্তে ফিরিয়া যাইতেছে তখন সেইটেকে আমাদের চেতনার উপর দিয়া বহিয়া যাইতে দিলে, আমরা জগতের পরম পরিণামটিকে যেন অনির্বচনীয়রূপে জানিতে পারি। সেখানে আমাদের সেই উপলব্ধি সেইখানে আমাদের প্রীতি, সেখানে আমাদের মন সেই অসীমের অভিমুখীন আনন্দ স্রোতের টানে উতলা হইয়া সেই দিকে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে চায়। সৌন্দর্যের ব্যাকুলতার ইহাই তাৎপর্য। যে-সুর অসীম হইতে বাহির হইয়া সীমার দিকে আসিতেছে তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল, তাহা নিয়মে বাঁধা, আকারে নির্দিষ্ট, তাহারই যে প্রতিধ্বনি সীমা হইতে অসীমের দিকে পুনশ্চ ফিরিয়া যাইতেছে তাহাই সৌন্দর্য, তাহাই আনন্দ। তাহাকে ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে আনা অসম্ভব। তাই সে এমন করিয়া ঘরছাড়া করিয়া দেয়। প্রতিধ্বনি কবিতার মধ্যে আমার মনের এই অনুভূতিই রূপকেও গানে ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছে। সে-চেষ্টার ফলটি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে এমন আশা করা যায় না, কারণ চেষ্টা বোধটাই আপনাকে আপনি স্পষ্ট করিয়া জানিত না।"[১০]

---

১০. রবীন্দ্র - জীবনস্মৃতি - প্রভাতসঙ্গীত, পৃ.স. ১০৩

" আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ এবং নিবিড় যোগ ছিল। বাড়ির ভিতরের নারিকেল গাছগুলি প্রত্যেকে আমার কাছে অত্যন্ত সত্য হইয়া দেখা দিত। নর্মাল ইস্কুল হইতে চারিটার পর ফিরিয়া গাড়ি হইতে নামিয়াই আমাদের বাড়ির ছাদটার পিছনে দেখিলাম, ঘন সজল নীল মেঘ রাশীকৃত হইয়া আছে - মনটা তখনই এক নিমেষে নিবিড় আনন্দের মধ্যে আবৃত হইয়া গেল - সেই মুহূর্তের কথা আজিও আমি ভুলিতে পারি নাই। সকলের জাগিবা মাত্রই সমস্ত পৃথিবীর জীবনোল্লাসে আমার মনকে তাহার খেলার সঙ্গীর মতো ডাকিয়া বাহির করিত, মধ্যাহ্নের সমস্ত আকাশ এবং প্রহর যেন সুতীব্র হইয়া উঠিয়া আপন গভীরতার মধ্যে আমাকে বিবাগী করিয়া দিত এবং রাত্রির অন্ধকার যে মায়াপথের গোপন দরজাটা খুলিয়া দিত তাহা সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা ছাড়াইয়া রূপকথার অপরূপ রাজ্যে সাতসমুদ্র তেরোনদী পার করিয়া লইয়া যাইত। তাহার পর একদিন যখন যৌবনের প্রথম উন্মেষে হৃদয় আপনার খোরাকের দাবি করিতে লাগিল, তখন ব্যথিত হৃদয়টাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নিজের মধ্যেই নিজের আবর্তন শুরু হইল, চেতনা তখন আপনার ভিতরের দিকেই আবদ্ধ হইয়া রহিল।" [১১]

" প্রকৃতির সৌন্দর্য যে কেবলমাত্র আমারই মনের মরীচিকা নহে, তাহার মধ্যে যে অসীমের আনন্দই প্রকাশ পাইতেছে এবং সেইজন্যই যে এই সৌন্দর্যের কাছে আমরা আপনাকে ভুলিয়া যাই, এই কথাটা নিশ্চয় করিয়া বুঝাইবার জায়গা ছিল বটে সেই কারোয়ারের সমুদ্রবেলা। বাহিরের প্রকৃতিতে যেখানে নিয়মের ইন্দ্রজালে অসীম আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন সেখানে সৌন্দর্য ও প্রীতির সম্পর্কে হৃদয় একেবারে অব্যবহিত ভাবে ক্ষুদ্রের মধ্যেও সেই ভূমার স্পর্শ লাভ করে, সেখানে সেই প্রত্যক্ষবোধের কাছে কোনো তর্ক খাটিবে কী করিয়া। এই হৃদয়ের পথ দিয়াই প্রকৃতি-সন্ন্যাসীকে আপনার

---

১১. তদেব, জীবনস্মৃতি - প্রভাত সংগীত, পৃ.স.১০৪

সীমা-সিংহাসনের অধিরাজ অসীমের খাস দরবারে লইয়া গিয়াছিলেন।" [১২]

"এক-এক বৎসরে বিশেষ এক একটা গ্রহ রাজার পদ ও মন্ত্রীর পদ লাভ করে, পঞ্জিকার আরম্ভেই পশুপতি ও হৈমবতীর নিভৃত আলাপে তাহার সংবাদ পাই। তেমনি দেখিতেছি, জীবনের এক-এক পর্যায়ে এক একটি ঋতু বিশেষভাবে আধিপত্য গ্রহণ করিয়া থাকে। বাল্যকালের দিকে যখন তাকাইয়া দেখি তখন সকলের চেয়ে স্পষ্ট করিয়া মনে পড়ে তখনকার বর্ষার দিনগুলি। বাতাসের বেগে জলের ছাঁটে বারান্দা একেবারে ভাসিয়া যাইতেছে, সারি সারি ঘরের সমস্ত দরজা বন্ধ হইয়াছে, প্যারীবুড়ি কষে একটা বড়ো ঝুড়িতে তরিতরকারি বাজার করিয়া ভিজিতে ভিজিতে জলকাদা ভাঙিয়া আসিতেছে, আমি বিনা কারণে দীর্ঘ বারান্দায় প্রবল আনন্দে ছুটিয়া বেড়াইতেছি। আর, মনে পড়ে, ইস্কুলে গিয়াছি, দরমায়-ঘেরা দালানে আমাদের ক্লাস বসিয়াছে; অপরাহ্নে ঘনঘোর মেঘের স্তূপে স্তূপে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে, দেখিতে দেখিতে নিবিড় ধারায় বৃষ্টি নামিয়া আসিল, থাকিয়া থাকিয়া দীর্ঘ একটানা মেঘ-ডাকার শব্দ, আকাশটাকে যেন বিদ্যুতের নখ দিয়া এক প্রান্ত হইতে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত কোন্ পাগলি ছিঁড়িয়া কাড়িয়া ফেলিতেছে, বাতাসের দমকায় দরজার বেড়া ভাঙিয়া পড়িতে চায়, অন্ধকারে ভালো করিয়া বইয়ের অক্ষর দেখা যায় না, পণ্ডিতমশায় পড়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, বাহিরের ঝড়-বাদলটার উপরেই ছুটা-ছুটি-মাতামাতির বরাত দিয়া বন্ধ ছুটিতে বেঞ্চির উপরে বসিয়া পা দুলাইতে দুলাইতে মনটাকে তেপান্তরের মাঠ পার করিয়া দৌড় করাইতেছি। আরও মনে পড়ে শ্রাবণের গভীর রাত্রি, ঘুমের ফাঁকের মধ্য দিয়া ঘনবৃষ্টির ঝম্‌ঝম্ শব্দ মনের ভিতরে সুপ্তির চেয়েও নিবিড়তর একটা পুলক জমাইয়া তুলিতেছে, একটু যেই ঘুম ভাঙিতেছে মনে মনে প্রার্থনা করিতেছি, সকালেও যেন এই বৃষ্টির বিরাম না

---

১২. তদেব, জীবনস্মৃতি - প্রকৃতির প্রতিশোধ, পৃ.স.১০৯

হয় এবং বাহিরে গিয়া যেন দেখিতে পাই, আমাদের গলিতে জল দাঁড়াইয়াছে এবং পুকুরের ঘাটের একটি ধাপও আর জাগিয়া নাই।

কিন্তু, আমি যে-সময়কার কথা বলিতেছি সে-সময়ের দিকে তাকাইলে দেখিতে পাই, তখন শরৎঋতু সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তখনকার জীবনটা আশ্বিনের একটা বিস্তীর্ণ স্বচ্ছ অবকাশের মাঝখানে দেখা যায় - সেই শিশিরে ঝলমল-করা সরস সবুজের উপর সোনা-গলানো রৌদ্রের মধ্যে, মনে পড়িতেছে, দক্ষিণের বারান্দায় গান বাঁধিয়া তাহাতে যোগিয়া সুর লাগাইয়া গুন্ গুন্ করিয়া গাহিয়া বেড়াইতেছি, সেই শরতের সকালবেলায়। -

আজি শরত-তপনে প্রভাতস্বপনে
কি জানি পরান কী যে চায়।

বেলা বাড়িয়া চলিতেছে, বাড়ির ঘণ্টায় দুপুর বাজিয়া গেল, একটা মধ্যাহ্নের গানের আবেশে সমস্ত মনটা মাতিয়া আছে, কাজকর্মের কোনো দাবিতে কিছুমাত্র কান দিতেছি না, সেও শরতের দিনে। -

হেলাফেলা সারাবেলা
এ কী খেলা আপন-মনে।

মনে পড়ে, দুপুরবেলায় জাজিম-বিছানো কোণের ঘরে একটা ছবি-আঁকার খাতা লইয়া ছবি আঁকিতেছি। সে-যে চিত্রকলার কঠোর সাধনা তাহা নহে - সে কেবল ছবি আঁকার ইচ্ছাটাকে লইয়া আপনমনে খেলা করা। যেটুকু মনের মধ্যে থাকিয়া গেল, কিছুমাত্র আঁকা গেল না, সেইটুকুই ছিল তাহার প্রধান অংশ। এদিকে সেই কর্মহীন শরৎ মধ্যাহ্নের একটি সোনালি রঙের মাদকতা দেয়াল ভেদ করিয়া কলিকাতা শহরের সেই একটি সামান্য ক্ষুদ্র ঘরকে পেয়ালার মতো আগাগোড়া ভরিয়া তুলিতেছে। জানি না কেন, আমার তখনকার জীবনের দিনগুলিকে যে-আকাশ যে-আলোকের মধ্যে দেখিতে পাইতেছি তাহা এই শরতের আকাশ, শরতের আলোক।

সে যেমন চাষিদের ধান-পাকানো শরৎ তেমনি সে আমার গান-পাকানো শরৎ, সে আমার সমস্ত দিনের আলোকময় অবকাশের গোলা-বোঝাই-করা শরৎ, আমার বন্ধনহীন মনের মধ্যে অকারণ পুলকে ছবি-আঁকানো গল্প-বানানো শরৎ।

সেই বাল্যকালের বর্ষা এবং যৌবনকালের শরতের মধ্যে একটা প্রভেদ এই দেখিতেছি যে, সেই বর্ষার দিনে বাহিরের প্রকৃতিই অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার সমস্ত দলবল সাজ-সজ্জা এবং বাজনা-বাদ্য লইয়া মহা সমারোহে আমাকে সঙ্গদান করিয়াছে। আর, এই শরৎকালের মধুর উজ্জ্বল আলোটির মধ্যে যে-উৎসব তাহা মানুষের। মেঘ-রৌদ্রের লীলাকে পশ্চাতে রাখিয়া সুখ-দুঃখের আন্দোলন মর্মরিত হইয়া উঠিতেছে, নীল আকাশের উপরে মানুষের অনিমেষ দৃষ্টির আবেশটুকু একটা রঙ মাখাইয়াছে, এবং বাতাসের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাবেগ নিশ্বসিত হইয়া বহিতেছে।" [১৩]

এরই সূত্র ধরে অনুরূপভাবে 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থ থেকে আরো কিছু নির্বাচিত অংশ সামনে রাখা যাক্ :

"আমি, কি আত্মার মধ্যে কি বিশ্বের মধ্যে, বিস্ময়ের অন্ত দেখি না। আমি জড় নাম দিয়া, সসীম নাম দিয়া, কোনো জিনিসকে একপাশে ঠেলিয়া রাখিতে আমার কাছে অসীম বিস্ময়াবহ। আমি এই জলস্থল তরুলতা পশুপক্ষী চন্দ্রসূর্য দিনরাত্রির মাঝখান দিয়া চোখ মেলিয়া চলিয়াছি, ইহা আশ্চর্য। এই জগৎ তাহার অণুতে-পরমাণুতে, তাহার প্রত্যেক ধূলিকণায় আশ্চর্য। আমাদের পিতামহগণ যে অগ্নিবায়ু-সূর্যচন্দ্র-মেঘবিদ্যুৎকে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা যে সমস্ত জীবন এই অচিন্তনীয় বিশ্বমহিমার মধ্য দিয়া সজীব ভক্তি ও বিস্ময় লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, বিশ্বের সমস্ত স্পর্শই তাঁহাদের অন্তরবীণায় নব নব স্তবসংগীত

---

১৩. তদেব, জীবনস্মৃতি - বর্ষা ও শরৎ, পৃ.স. ১২০-১২২

ঋংকৃত করিয়া তুলিয়াছিল - ইহা আমার অন্তঃকরণকে স্পর্শ করে। সূর্যকে যাহারা অগ্নিপিন্ড বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায় তাহারা যেন জানে যে, অগ্নি কাহাকে বলে। পৃথিবীকে যাহারা 'জলরেখাবলয়িত' মাটির গোলা বলিয়া স্থির করিয়াছে তাহারা যেন মনে করে যে, জলকে জল বলিলেই সমস্ত জল বোঝা গেল এবং মাটিকে মাটি বলিলেই সে মাটি হইয়া যায়।

প্রকৃতি সম্বন্ধে আমার পুরাতন তিনটি পত্র হইতে তিন জায়গা তুলিয়া দিব -

এমন সুন্দর দিনরাত্রিগুলি আমার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে - এর সমস্তটা গ্রহণ করতে পারছিনে। এই সমস্ত রঙ, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোক-ভূলোকের মাঝখানের সমস্ত-শূণ্য-পরিপূর্ণ-করাশান্তি এবং সৌন্দর্য-এর জন্যে কি কম আয়োজনটা চলছে ? কত বড়ো উৎসবের ক্ষেত্রটা। এতবড়ো আশ্চর্য কান্ডটা প্রতিদিন আমাদের বাইরে হয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের ভিতরে ভালো করে তার সাড়াই পাওয়া যায় না। জগৎ থেকে এতই তফাতে আমরা বাস করি। লক্ষ লক্ষ যোজন দূর থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে অনন্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা করে একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়, আর আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করতে পারে না। মনটা যেন আরো শতলক্ষ যোজন দূরে। রঙিন সকাল এবং রঙিন সন্ধ্যাগুলি দিগ্‌বধূদের ছিন্ন কণ্ঠহার হতে এক-একটি মাণিকের মতো সমুদ্রের জলে খসে খসে পড়ে যাচ্ছে, আমাদের মনের মধ্যে একটাও এসে পড়ে না। ... যে পৃথিবীতে এসে পড়েছি, এখানকার মানুষগুলি সব অদ্ভুদ জীব। এরা কেবলই দিন-রাত্রি নিয়ম এবং দেয়াল গাঁথছে - পাছে দুরটা চোখে কিছু দেখতে পায় এইজন্যে পর্দা টাঙিঁয়ে দিচ্ছে - বাস্তবিক পৃথিবীর জীবগুলো ভারি অদ্ভুত। এরা যে ফুলের গাছে -

এক একটি ঘেরাটোপ পরিয়ে রাখে নি, চাঁদের নিচে চাঁদোয়া খাটায় নি, সেই আশ্চর্য! এই স্বেচ্ছা-অন্ধগুলো বন্ধ পাল্‌কির মধ্যে চড়ে পৃথিবীর ভিতর দিয়ে কী দেখে চলে যাচ্ছে।

একসময় যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলেম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত-শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধ উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর দূরান্তর দেশ-দেশান্তরের জল স্থল ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নিচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতেম, তখন শরৎসূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে-একটি আনন্দরস, যে-একটি জীবনীশক্তি, অত্যন্ত অব্যক্ত, অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎ ভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই - যে মনের ভাব, এ যেন এই প্রতিনিয়ত অংকুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসমান আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে, এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর থর করে কাঁপছে।

এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন। ... আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্বে তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন - তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলেম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলছে এবং অবোধ মাতার মতো আপনার নবজাত ক্ষুদ্র-ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্বাঙ্গ দিয়ে সূর্যালোক পান করেছিলেম - নবশিশুর মতো একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বর তলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলেম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত

শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এবং স্তন্যরস পান করেছিলায়। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নবপল্লব উদ্‌গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন ঘনশ্যামছটায় আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত। তার পরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে। আমার বসুন্ধরা এখন একখানি রৌদ্রপীতহিরণ্য অঞ্চল পরে ঐ নদীতীরের শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন - আমি তাঁর পায়ের কাছে, কোলের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়ছি। অনেক ছেলের মা যেমন অর্ধমনস্ক অথচ নিশ্চল সহিষ্ণুভাবে আপন শিশুদের আনাগোনার প্রতি তেমন দৃক্‌পাত করেন না, তেমনি আমার পৃথিবী এই দুপুরবেলায় ঐ আকাশপ্রান্তের দিকে চেয়ে বহু আদিম কালের কথা ভাবছেন - আমার দিকে তেমন লক্ষ্য করছেন না, আর আমি কেবল অবিশ্রাম বকেই যাচ্ছি।

প্রকৃতি তাহার রূপরস বর্ণগন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধিমন তাহার স্নেহপ্রেম লইয়া, আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে - সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না, সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে, তাহাকে আমাকে বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে। নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, নৌকাকে টানিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। জগতের সমস্ত আকর্ষণ পাশ আমাদিগকে তেমনি অগ্রসর করিতেছে।" [১৪]

উদ্ধৃতির পরিমাণ একটু বেশী হয়ে গেল। কিন্তু তার প্রয়োজন ছিল। কারণ কবির নিজের মন্তব্যের আলোকে কবির মানস বিশ্লেষণের একটা সুবিধে আছে। অথবা, কবিকে ঠিকমতো বোঝবার জন্যে তাঁর আত্মবিশ্লেষণ উপাদান হিসেবে মূল্যবান। এই কারণেই

---

১৪. তদেব, আত্মপরিচয়, ১ নয় প্রবন্ধ, পৃ.স.১৭৬-১৭৮

প্রকৃতি সম্পর্কে কবির নিজের বক্তব্য বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরতে হ'ল। কবির পূর্বোক্ত মন্তব্যগুলির সমাস করলে এইরকম দাঁড়ায় :

১. "যে মৃর্তিকার আমাকে বানিয়ে তুলেছেন, তাঁর হাতের প্রথম কাজ বাংলাদেশের মাটি দিয়ে তৈরী।"

২. "মন চলে যায় - যেখানে আকাশের শেষ নীল মিশে গেছে পৃথিবীর শেষ সবুজে"।

৩. " বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন-কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন খুশি যাওয়া-আসা করিতে-পারিতাম না। সেইজন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল আবডাল হইতে দেখিতাম।"

৪. "আমার শিশুকালেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে আমার খুব একটি সহজ এবং নিবিড় যোগ ছিল।"

৫. " একসময় যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়েছিলেম,"

৬. " এই পৃথিবীটি আমার অনেক দিনকার এবং অনেক জন্মকার ভালোবাসার লোকের মতো আমার কাছে চিরকাল নতুন।"

৭. " প্রকৃতি তাহার রূপরস বর্ণগন্ধ-লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধিমন তাহার স্নেহপ্রেম লইয়া, আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে। "

রবীন্দ্রনাথের আত্মবিশ্লেষণ থেকেই বোঝা যায় যে প্রকৃতিই তাঁর জীবনের মৌল প্রাথমিক উপাদান যাকে আশ্রয় করে তাঁর অন্যান্য বোধ গড়ে উঠেছে। (রবীন্দ্রনাথ মূলত প্রকৃতির কবি। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় অন্তরঙ্গতার মধ্যে তাঁর কবি প্রতিভার মূল উপাদানটি নিহিত আছে। প্রকৃতি-প্রেম রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের শুধু একটি বিশেষ লক্ষণ মাত্র নয়, এটা তাঁর কবিসত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ।)[১৫] এবং যার উপর ভিত্তি ক'রে তাঁর জীবনের অন্যান্য

---

১৫. অমিয়কুমার সেন, প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ, নিবেদন, বিঃ ভাঃ, ১ম সং, ১৩৫৪ ৭ই পৌষ

ক্ষেত্রে কাঠামো তৈরী হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যের অন্য দুটি উপাদান - মানবপ্রীতি ও অরূপানুভূতি, এই প্রকৃতিকে আশ্রয় করেই বিধৃত হয়েছে, তাও স্বীকার করতে হবে। রবীন্দ্রকাব্যে এই তিনটি উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক একটি চিত্রের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে :

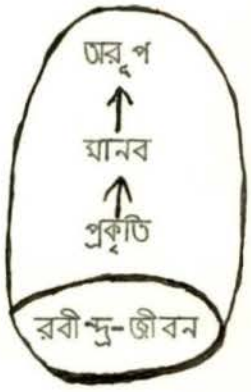

রবীন্দ্র-কাব্যের ভূষন

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের জীবনের ধারাবাহিকতার দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখবো, তিনি তাঁর জীবনের প্রাথমিক পর্বে প্রকৃতির প্রতি সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ অনুভব করেছেন। প্রকৃতির রহস্যকে উদ্‌ঘাটন করবার ব্যাকুলতা তখন থেকেই জেগেছে। প্রকৃতিকে কেন্দ্র করেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে এবং বিশ্বচরাচরের আবরণ উন্মোচিত হয়েছে। কখনো নির্জন দুপুর, কখনো পুকুরধারের শ্যামল ছায়া, কখনো গঙ্গাতীরের স্নিগ্ধতা, কখনো বা রাতের তারা-খচিত নিস্তব্ধ আকাশ, কখনো বা হিমালয়ের উদার গম্ভীর রূপ, আবার কখনো খোয়াইয়ের সর্পিলতার ভিতর দিয়ে তাঁর অন্তরে প্রকৃতি অনুভূতির উদ্‌বোধন হয়েছিল। পরে, যৌবনে যখন তিনি পদ্মাতীরবর্তী উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এবং তারও পরে যখন বোলপুরের ধু ধু মাঠের প্রান্তে স্থায়ী ভাবে বাসা বেঁধেছেন, তখন সেই প্রকৃতি-প্রীতি আরো ঘণীভূত হয়েছে এবং অবশেষে তিনি প্রকৃতি সম্পর্কে একটা শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রবীন্দ্রকাব্যে এর প্রতিফলন ঘটেছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনে পর্বে পর্বে যেমন করে প্রকৃতিকে অনুভব করেছেন, তেমনি করেই তাঁর প্রকৃতিচেতনা কাব্যে বিধৃত হয়েছে।

ভেবে দেখতে গেলে প্রকৃতিই মানবজীবনের সবচেয়ে বড় আশ্রয় এবং প্রকৃতিরি ভিতর দিয়েই মানুষ তার জীবনের সার্বভৌম সত্য অনুভব করতে পারে। পৃথিবীর সেই আদিলগ্নে যখন 'পৃথিবী সদ্যস্নাতা রমনীর মতো আস্তে আস্তে জেগে উঠেছে, শুধুমাত্র প্রকৃতিকে জন্ম দিয়েই আপন কক্ষ পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তখনকার সেই প্রকৃতির আদি ও আদিম রূপটি পৃথিবীর বুকে চিরকালের মতো বিধৃত হয়ে গেছে। প্রকৃতি তার আপন শরীর নিয়ে আবর্তিত হয়ে চলেছে নদীসাগর প্রান্ত-প্রান্তান্তর বনানীকে বুকে ধরে। ঋতুচক্রে ঘুরে ফিরে এই প্রকৃতি একদিকে যেমন মধুর কোমল অন্যদিকে তেমনি ভয়ংকরী। একদিকে সে যেমন তার রূপলাবণ্যে দৃষ্টিকে সম্মোহিত করে, অন্যদিকে তেমনি সে সংহারিনীর বেশে সংহার করে। এই হচ্ছে প্রকৃতির আসল রূপ। মাধুর্য ও ভীষণতায়, কোমলে ও কঠোরে, আলো ও অন্ধকারে প্রকৃতি নিজেকে যেমন মেলে ধরে, তেমনি সে নিজেকে ঢেকেও রাখে। আকাশ সাগর পর্বত বনানীর পসরা সাজিয়ে প্রকৃতি যেমন একদিকে আমাদের অতিমুহূর্তে কাছে টানে নেয়, অন্যদিকে তেমনি প্রগাঢ় অন্ধকারের যবনিকায় দূর দিগন্তের অন্তরালে নিজেকে গভীর রহস্যে ঢেকে আমাদের ভুলিয়ে নিয়ে যায়। এইভাবেই প্রকৃতি আমাদের সামনে যুগ যুগ ধরে বিরাজমানা থেকে আমাদের জীবনের পরম আশ্রয় হয়ে ওঠে। এই কারণেই আমরা শুধুমাত্র প্রকৃতির আশ্রয়েই জীবনের গূঢ়তম সত্যকে অনুভব করতে পারি।

স্বভাবতই, মূলতঃ এই কারণেই, মানুষের জীবনের প্রাথমিক ভিত রচিত হয় প্রকৃতির ভিত রচিত হয় প্রকৃতির দ্বারা। আমরা জন্ম নিই বিশিষ্ট পারিবারিক পরিবেশে, তার মধ্যেই আমরা লালিত-পালিত হয়ে বেড়ে উঠি। কিন্তু আমাদের জীবনের প্রাথমিক

লগ্নে যা আমাদের সবচেয়ে বেশি করে প্রভাবিত করে তা হচ্ছে প্রকৃতির দাক্ষিণ্য। কেননা, শৈশবে একজন শিশুর কাছে তার পারিবারিক পরিবেশ পরিচিত হলেও তার চারপাশের প্রাকৃত জগৎ থাকে সম্পূর্ণ অচেনা, রহস্যময়। সেই রহস্যময় প্রাকৃত জগৎ ক্ষণে ক্ষণে তার চোখে অঞ্জন মাখিয়ে দেয়, ক্ষণে ক্ষণে তাকে একটা রহস্যময় অনির্বচনীয় জগতের দিকে আকর্ষণ করে। বিভূতিভূষণের অপুর মধ্যে, ওয়ার্ডওয়ার্থের লুসির মধ্যে শিশুর ভিতরকার এই ছবিটি পাই - তারা যেন প্রকৃতির মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে জীবনকে বুঝতে শিখেছে।

সুতরাং, সহজেই বোঝা যায়, মানুষের জীবনে কেন প্রকৃতির প্রভাব সবচেয়ে বেশি করে পড়ে, এবং কেনই বা মানুষ তার জীবনে ক্ষণে ক্ষণে সেই প্রকৃতির কোলে বারংবার ছুটে যায়।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এই সত্য আমরা ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করি।

স্বভাবতই, প্রকৃতিকে দূরে সরিয়ে রেখে কবিরা কাব্যসৃষ্টি করতে পারেননি কখনো। কেন না, প্রকৃতি তাঁদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই দেখতে পাই, প্রাচীনকাল থেকেই প্রকৃতি কাব্যে একটা বিশেষ মর্যাদা পেয়ে এসেছে। নিছক প্রাকৃতিক বর্ণনার মধ্যেই নয়, প্রকৃতি কখনো কখনো হয়ে উঠেছে কাব্যে বর্ণিত মুখ্য চরিত্র-স্বরূপে, এমনকি কাব্যের মৌল উৎস ও প্রেরণা। একথার তাৎপর্য খুঁজে পাই - যদি আমরা ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করি। এর সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়ে গেছে অবশ্য কালিদাস ও ভবভূতির কাব্যে।

তবু, কাব্যে প্রকৃতির স্থান কীভাবে একটা প্রধান ভূমিকা নেয়, তার বিশেষ রূপ দেখি উনিশ শতকের রোমান্টিক আন্দোলন ও সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে। উনিশ শতকে য়ুরোপে, বিশেষত ইংরেজি সাহিত্যে যে রোমান্টিক আন্দোলন শুরু হয়, তার অন্যতম

মৌল প্রেরণা ছিল প্রকৃতি-প্রীতি। প্রকৃতিকে নতুন চোখে দেখে, প্রকৃতির মধ্যে জীবনের চরিতার্থতা খুঁজে পেয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছিলেন যে, প্রকৃতিই মানুষের সবচেয়ে বড় আশ্রয় এবং প্রকৃতির কাছে থেকেই মানুষ সব কিছু পেতে পারে। অতঃপর, ফরাসী আন্দোলনের আদর্শে অনুপ্রাণিত নির্বাসিত লোক গোষ্ঠীর কবিকুল শেলী, কীটস এবং বায়রণের কাব্যে দেখা গেল প্রকৃতির রহস্য আবিষ্কারের প্রয়াস, প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ ও আত্মজিজ্ঞাসার নিবেদন। এই নব্য রোমান্টিক কাব্যে প্রকৃতির নবরূপ ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কাব্যসৃষ্টিতে প্রকৃতির প্রয়োজন আবার নতুন করে অনুভব করা গেল।

রবীন্দ্রনাথ জন্মেছেন উনিশ শতকের এই রোমান্টিক আবহাওয়া ও সাহিত্যাদর্শের পারিপার্শ্বিকতায়। বলা বাহুল্য, স্থান কাল পাত্রের দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে ইংরেজি রোমান্টিক সাহিত্যের ঢেউ আসতে দেরী হয় নি। স্বভাবতই তার ফলে বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণ ঘটেছিল এবং যে যে দিক থেকে এই নব জাগরণের প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল, তার অন্যতম উপাদান প্রকৃতি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা-কাব্যে প্রকৃতির স্থান ছিল নিতান্তই সাদামাটা বাহ্যিক বর্ণনার মধ্যে কদাচিৎ ভাবানুসঙ্গ হিসেবে,। কিন্তু প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রূপের ও তার রহস্যময়তার উদ্‌ঘাটনে রোমান্টিক কবি সমাজের মতো রবীন্দ্রনাথ অবশেষে প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে মেলে ধরলেন। তারই উৎসার রয়ে গেছে তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে। বিশেষতঃ কাব্যে ও গানে। এমনকি কয়েকটি নাটকের মধ্যেও। এখানে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে প্রকৃতি কীভাবে স্থান করে নিয়েছে। তার দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর কাব্য, গান ও নাটক থেকে কিছু নির্বাচিত অংশ তুলে ধরছি।

প্রথমে, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন কাব্য থেকে প্রকৃতি বিষয়ক কবিতাগুলির নির্বাচিত তালিকা :

সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যগ্রন্থ থেকে নির্বাচিত 'প্রকৃতি' বিষয়ক কবিতা -

প্রথম খন্ড : প্রভাতসংগীত

১। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ - আজি এ প্রভাতে

২। প্রভাত-উৎসব - হৃদয় আজি মোর

৩। অনন্ত জীবন - অধিক করি না আশা

ছবি ও গান

১। বাদল - একলা ঘরে বসে আছি

২। মধ্যাহ্ন - হেরো ওই বাড়িতেছে

৩। পূর্ণিমায় - যাই যাই ডুবে যাই

ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

১ নং কবিতা - বসন্ত আওল রে !

১৩ নং কবিতা - সজনি গো, শাওন ঘোর ঘনঘটা

কড়ি ও কোমল

১। বনের ছায়া - কোথা রে তরুর ছায়া

২। বসন্ত অবসান - কখন বসন্ত গেল, এবার হল না গান

৩। সন্ধ্যার বিদায় - সন্ধ্যা যায়, সন্ধ্যা ফিরে চায়

৪। রাত্রি - জগতেরে জড়াইয়া

৫। সমুদ্র - কিসের অশান্তি

মানসী

১। একাল ও সেকাল - বর্ষা এলায়েছে
২। নিষ্ঠুর সৃষ্টি - মনে হয় সৃষ্টি বুঝি
৩। প্রকৃতির প্রতি - শত শত প্রেম পাশে
৪। কুহুধ্বনি - প্রখর মধ্যাহ্ন তাপে
৫। সিন্ধুতরঙ্গ - দোলেরে প্রলয় দোলে রে
৬। শ্রাবণের পত্র - বন্ধু হে, পরিপূর্ণ বরষায়
৭। বধূ - বেলা যে পড়ে এল
৮। বর্ষার দিনে - এমন দিনে তারে বলা যায়
৯। মেঘদূত - কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
১০। অহল্যার প্রতি - কী স্বপ্নে কাটালে

সোনার তরী

১। সোনার তরী - গগনে গরজে মেঘ
২। বর্ষাযাপন - রাজধানী কলিকাতা, তেতলার ছাতে -
৩। সমুদ্রের প্রতি - হে আদি জননী সিন্ধু
৪। ভরা বাদরে - নদী ভরা কূলে কূলে
৫। বসুন্ধরা - আমারে ফিরায়ে লহ

নদী

১। নদী

চৈতালী

১। মধ্যাহ্ন - বেলা দ্বিপ্রহর
২। প্রভাত - নির্মল তরুণ উষা

কল্পনা

১। বর্ষামঙ্গল - ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
২। শরৎ - আজি কি তোমার
৩। বসন্ত - অয়ুত বৎসর আগে
৪। বৈশাখ - হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ
৫। আষাঢ় - নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে

দ্বিতীয় খণ্ড

শিশু

১। শীত - পাখি বলে, আমি চলিলাম
২। শীতের বিদায় - বসন্ত ঝলক মুখ ভরা হাসিটি
৩। ফুলের ইতিহাস - বসন্ত প্রভাতে এল মালতী
৪। পুরোনো বট - লুটিয়ে পড়ে জটিল জটা

খেয়া

১। বৈশাখ - তপ্ত হাওয়া দিয়েছে
২। ঝড় - আকাশ ভেঙেঁ বৃষ্টি পড়ে
৩। বর্ষাপ্রভাত - ওগো এমন সোনার
৪। বর্ষাসন্ধ্যা - আমার অমনি খুশী

গীতাঞ্জলি

১১ নং কবিতা - আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ

১৮ নং কবিতা আজি শ্রাবণ ঘন

১৯ নং - আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল

২০ নং - আজি ঝড়ের রাতে

৮ নং - আজ ধানের ক্ষেতে

৩৮ নং - শরতে আজ কোন্ অতিথি

৫৫ নং - আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে

৯৯ নং - আবার এনেছে আষাঢ়

১০০ নং - আজ বরষার রূপ

গীতিমাল্য

৩ নং কবিতা - ওগো শেফালি বনের

গীতালি

১৩ নং কবিতা - আবার শ্রাবণ হয়ে

১৫ নং - এই শরৎ আলোর

২৬ নং - শরৎ তোমার অরুণ

বলাকা

২৫ নং কবিতা - যে বসন্ত একদিন

২৬ নং কবিতা - এবারে ফাল্গুনের দিনে

৩৫ নং কবিতা - আজ প্রভাতের আকাশটি

৩৬ নং কবিতা - সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের

শিশু ভোলানাথ

১। তালগাছ - তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে

২। বৃষ্টি রৌদ্র - ঝুটি বাঁধা ডাকাত

পূরবী

১। মাটির ডাক - শালবনের ঐ আঁচল
২। আগমণী - মাঘের বুকে সকৌতুকে
৩। বাতাস - গোলাপ বলে, ওগো বাতাস
৪। সমুদ্র - হে সমুদ্র, স্তব্ধ চিত্তে
৫। ঝড় - অন্ধ কেবিন আলোয়
৬। শীত - শীতের হাওয়া
৭। প্রভাত - স্বর্ণ-সুধা-ঢালা
৮। প্রভাতী - চপল ভ্রমর, হে
৯। প্রাণগঙ্গা - প্রতিদিন নদীস্রোতে

মহুয়া

১। বসন্ত - ওগো বসন্ত
২। মাধবী - বসন্তের জয়রবে
৩। নির্ঝরিনী - ঝরনা, তোমার
৪। মহুয়া - বিরক্ত আমার মন

বনবাসী

১। বৃক্ষবন্দনা - অন্ধভূমি গর্ভ হতে
২। দেবদারু - তপোমগ্ন হিমাদ্রির
৩। আম্রবন - তব পথছায়া বাহি
৪। নীলমনিলতা - ফাল্গুন মাধুরী তার

৫। শাল - বাহিরে যখন

৬। কুরচি - (ভ্রমর একদা ছিল) কুরচি, তোমার লাগি

৭। মধুমঞ্জরি - প্রত্যাশী হয়ে ছিনু

৮। নারিকেল - সমুদ্রের কূল হতে

৯। চামেলি-বিতান - ময়ূর কর নি

১০। হাসির পাথেয় - হিমালয় গিরিপথে

১১। বৃক্ষরোপন উৎসব - ১) মরু বিজয়ের কেতন
২) আয় আমাদের

১২। ক্ষিতি - বক্ষের ধন

১৩। অপ - হে মেঘ

১৪। তেজ - সৃষ্টির প্রথম

১৫। মরুৎ - হে পবন

১৬। ব্যোম্ - আকাশ, তোমার

১৭। মাঙ্গলিক - প্রাণের পাথেয়

তৃতীয় খন্ড

পুনশ্চ

১। কোপাই - পদ্মা কোথায় চলেছে

২। খোয়াই - পশ্চিম বাগান বন

৩। পুকুরধারে - দোতলার জানলা থেকে

বীথিকা

১। মাটি - বাখাঁরির বেড়া দেওয়া ভূমি

২। দেবদারু - দেবদারু, তুমি মহাবাণী

৩। বনস্পতি - কোথা হতে পেলে

৪। ভীষণ - বনস্পতি, তুমি যে ভীষণ

৫। আশ্বিনে - আকাশ আজিকে নির্মলতম নীল

পত্রপুট

১। ৪ নং কবিতা - একদিন আষাঢ়ে নামল

২। ৮ নং কবিতা - আমাকে এনে দিল

৩। ৯ নং কবিতা - হেঁকে উঠল ঝড়

ছড়ার ছবি

১। ঝড় - দেখ্ রে চেয়ে নামল

২। পম্পায় - আমার নৌকো বাঁধা ছিল

৩। তালগাছ - বেড়ার মধ্যে একটি আমের গাছে

৪। আকাশ - শিশুকালের থেকে

৫। অজয় নদী - এক কালে এই অজয় নদী

সেঁজুতি

১। সন্ধ্যা - চলেছিল সারা প্রহর

২। ভাগীরথী - পূর্বযুগে, ভাগীরথী

আকাশপ্রদীপ

১। জল - ধরাতলে

২। আমগাছ - এ তো সহজ কথা

নবজাতক

১। ভূমিকম্প - হায় ধরিত্রী, তোমার আঁধার

চতুর্থ খণ্ড

চিত্রা

১। মোতিবিল - নাম তার মোতিবিল
২। ছোটোনদী - আমাদের ছোটোনদী
৩। ফুল - কাল ছিল ডাল খালি
৪। শরৎ - এসেছে শরৎ, হিমের পরশ
৫। শীত - অঘ্রাণ হল সারা
৬। ঝোড়োরাত - ঢেউ উঠেছে জলে
৭। ফাল্গুন - ফাল্গুনে বিকশিত

গীতবিতান থেকে নির্বাচিত 'প্রকৃতি' বিষয়ক গানের তালিকা এখন তুলে ধরছি :-

গ্রীষ্ম :

প্রকৃতি

৩ সংখ্যক - এ কি আকুলতা ভুবনে
৮ সংখ্যক - আকাশ ভরা সূর্যতারা
১০ সংখ্যক - নাই রস নাই
১৩ সংখ্যক - হৃদয় আমার, ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে
১৪ সংখ্যক - এসো এসো হে বৈশাখ

২০ সংখ্যক কবিতা - বৈশাখ হে, মৌণী তাপস,

২৫ সংখ্যক কবিতা - চক্ষে আমার তৃষ্ণা

বর্ষা

প্রকৃতি

২৬ সংখ্যক - এসো শ্যামল সুন্দর

৩২ সংখ্যক - মেঘের পরে মেঘ জমেছে

৬৫ সংখ্যক - আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে আমার মনে

৭১ সংখ্যক - বহু যুগের ওপার হতে

৭৩ - এ গভীর বাণী এল

৮০ - কোথা যে উদাও হল মোর প্রাণ উদাসী

৯৫ - আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার

১২০ - আমি কী গান গাব যে ভেবে না পাই -

১২১ - কিছু বলবো বলে এসেছিলেম

১৩৩ - এসেছিলে তবু আস নাই জানায়ে গেলে

শরৎ

প্রকৃতি

১৪১ সংখ্যক - আজি শরৎ তপনে প্রভাত স্বপনে

১৪২ - মেঘের কোলে রোদ হেসেছে

১৪৩ - আজ ধানের ক্ষেতে

১৪৪ - বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ আমরা

১৪৫ - অমল ধবল পালে লেগেছে

১৬৫ - আমার রাত পোহালো শারদ প্রাতে

হেমন্ত

প্রকৃতি

১৭১ সংখ্যক - হিমের রাতে ওই গগনের দীপগুলিরে

১৭৪ সংখ্যক - সেদিন আমায় বলেছিলে আমার সময় হয় নাই -

শীত

প্রকৃতি

১৭৬ সংখ্যক - শীতের হাওয়ায় লাগল নাচন

১৭৯ - পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে

১৮২ - আর নাই যে দেরী

বসন্ত

প্রকৃতি

১৯০ সংখ্যক - আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে

১৯৭ - ওরে গৃহবাসী

২০৪ - ওগো দখিন হাওয়া, ও পথিক হাওয়া

২০৭ - ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে

২২২ - ও আমার চাঁদের আলো

২৪৮ - বসন্তে বসন্তে তোমার কবিরে দাও ডাক

২৪৯ - আমার মল্লিকা বনে, যখন প্রথম ধরেছে কলি

২৮৩ - ঝরা পাতা গো

রবীন্দ্র-নাটক থেকে 'প্রকৃতি' বিষয়ক নির্বাচিত অংশের তালিকা তুলে ধরা হল।

১) সন্ন্যাসী । (বালকদের প্রতি) বাবা, আজ যে তোমাদের সব সোনার রঙের কাপড় পরতে হবে।

ছেলেরা । সোনার রঙের কাপড় কেন ঠাকুর ?

সন্ন্যাসী । বাইরে যে আজ সোনা ঢেলে দিয়েছে। তারই সঙ্গে আমাদেরও আজ অন্তরে বাইরে মিলে যেতে হবে তো, নইলে এই শরতের উৎসবে আমরা যোগ দিতে পারব কী করে ? আজ এই আলোর সঙ্গে আকাশের সঙ্গে মিলব বলেই তো উৎসব।

ছেলেরা। সোনার রঙের কাপড় পাব ঠাকুর ?

সন্ন্যাসী । ওই বেতসিনীর ধার দিয়ে যাও। সেখানে বটতলার পোড়ো মন্দিরটা আছে সেই মন্দিরটায় সমস্ত সাজানো আছে। ঠাকুর্দা, তুমি এদের তুমি এদের সাজিয়ে আনো গে।

ঠাকুরদাদা । তবে চলো সবাই।

(শারদোৎসব)

২) রাজা । আমার কোনো রূপ কি তোমার মনে আসে না।

সুদর্শনা । এক রকম করে আসে বই কি ! নইলে বাঁচব কী করে।

রাজা । কি রকম দেখেছ ।

সুদর্শনা । সে তো একরকম নয় ! নববর্ষার দিনে জল-ভরা মেঘে আকাশের শেষ প্রান্তে বনের রেখা যখন নিবিড় হয়ে ওঠে তখন বসে বসে মনে করি, আমার রাজার রূপটি বুঝি এইরকম - এমনি নেমে আসা, এমনি ঢেকে-দেওয়া, এমনি চোখ-জুড়ানো, এমনি হৃদয়-ভরানো, চোখের পল্লবটি এমনি ছায়া-মাখা, মুখের হাসিটি এমনি গভীরতার মধ্যে ডুবে-থাকা। আবার শরৎকালে আকাশের পর্দা যখন দূরে উড়ে চলে

যায় তখন মনে হয়, তুমি আমার পথিক বন্ধু, 'তোমার সঙ্গে যদি চলতে পারি তা হলে দিগন্তে দিগন্তে সোনার সিংহ দ্বার খুলে যাবে, শুভ্রতার ভিতর মহলে প্রবেশ করব। আর যদি না পারি তবে এই বাতায়নের ধারে বসে কোন্-এক অনেক দূরের জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস উঠতে থাকবে, কেবলই দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, অজ্ঞাত বনের পথশ্রেণী আর অনাঘ্রাত ফুলের গন্ধের জন্য বুকের ভিতরটা কেঁদে কেঁদে ঝুরে ঝুরে মরবে। আর বসন্তকালে এই যে সমস্ত বন রঙে রঙিন, এখন আমি তোমাকে দেখতে পাই কানে কুণ্ডল, হাতে অঙ্গদ, গায়ে বাসন্তী রঙের উত্তরীয়, হাতে অশোকের মঞ্জরী, তালে তালে তোমার বীণার স্রব-কটি সোনার তার উতলা।

রাজা। এত বিচিত্র রূপ দেখছ, তবে কেন সব বাদ কেবল একটি বিশেষ মূর্তি দেখতে চাচ্ছ। সেটা যদি তোমার মনের মতো না হয় তবে তো সমস্ত গেল।

('রাজা' থেকে)

৩) ঠাকুরদা । সে ভারি আশ্চর্য জায়গা। সে পাখিদের দেশ - সে পাখিদের দেশ - সেখানে মানুষ নেই। তারা কথা কয় না, চলে না, তারা গান গায়, আর ওড়ে।

অমল। বাঃ, কী চমৎকার। সমুদ্রের ধারে ?

ঠাকুরদা। সমুদ্রের ধারে বই কি।

অমল। সব নীল রঙের পাহাড় আছে ?

ঠাকুরদা । নীল পাহাড়েই তো তাদের বাসা। সন্ধ্যের সময় সেই পাহাড়ের উপর সূর্যাস্তের আলো এসে পড়ে আর ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজ রঙের পাখি তাদের বাসায় ফিরে আসতে থাকে - সেই আকাশের রঙে পাখির রঙে পাহাড়ের রঙে সে এক কান্ড হয়ে ওঠে।

অমল । পাহাড়ে ঝরনা আছে ?

ঠাকুরদা । বিলক্ষণ, ঝরনা না থাকলে কি চলে। একেবারে হীরে গালিয়ে ঢেলে দিচ্ছে। আর তার কী নৃত্য। নুড়িগুলোকে ঠুং-ঠাং ঠুং-ঠাং করে বাজাতে বাজাতে কেবলই কল্ কল্ ঝর্ ঝর্ করতে করতে ঝরনাটি সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে। কোনো কবিরাজের বাবার সাধ্য নেই তাকে একদণ্ড কোথাও আটকে রাখে। পাখিগুলো আমাকে নিতান্ত তুচ্ছ একটা মানুষ বলে যদি একঘরে করে না রাখত তাহলে ওই ঝরনার ধারে তাদের হাজার হাজার বাসার একপাশে বাসা বেঁধে সমুদ্রের ঢেউ দেখে দেখে সমস্ত দিনটা কাটিয়ে দিতুম।

('ডাকঘর' থেকে)

৪) এবার আমাদের বসন্ত-উৎসবে এ কী রকম সুর লাগছে। এ যেন ঝরা পাতার সুর।

এতদিন বসন্ত তার চোখের জলটা আমাদের কাছে লুকিয়ে ছিল।

ভেবেছিল আমরা বুঝতে পারব না, আমরা যে যৌবনে দুরন্ত। আমাদের কেবল হাসি দিয়ে ভুলোতে চেয়েছিল।

কিন্তু আজ আমরা আমাদের মনকে মজিয়ে নেব এই সমুদ্রপারের দীর্ঘ-নিশ্বাসে।

প্রিয়া এই পৃথিবী আমাদের প্রিয়া। এই সুন্দরী পৃথিবী। সে চাচ্ছে আমাদের যা আছে সমস্তই - আমাদের হাতের স্পর্শ, আমাদের হৃদয়ের গান -

চাচ্ছে যা আমাদের আপনার মধ্যে আপনার কাছ থেকেও লুকিয়ে আছে।

ও যে কিছু পায় কিছু পায় না, এইজন্যেই ওর কান্না। পেতে পেতেই সব হারিয়ে যায় ।

ওগো পৃথিবী, তোমাকে আমরা ফাঁকি দেব না।

('ফাল্গুনী')

৫) নেপথ্যে । বসন্ত-পূর্ণিমার উৎসব তো এল।

সুরঙ্গমা । আমাকে কী কাজ করতে হবে ?

নেপথ্যে। আজ তোমার কাজের দিন নয়, সাজের দিন। পুষ্পবনের আনন্দে মিশিয়ে দিয়ো প্রাণের আনন্দ।

সুরঙ্গমা । তাই হবে প্রভু।

নেপথ্যে। সুদর্শনা আমাকে চোখে দেখতে চান।

সুরঙ্গমা। কোথায় দেখবেন ?

নেপথ্যে। যেখানে পশ্চিমে বাঁশি বাজবে, পুষ্পকেশরের ফাগ উড়বে, আলোর ছায়ায় হবে গলাগলি সেই দক্ষিণের কুঞ্জবনে।

('অরূপরতন)

৬) সঞ্জয় । কোথায় তোমার ডাক পড়েছে তুমি চলেছ, তা নিয়ে আমি প্রশ্ন করতে চাইনে। কিন্তু যুবরাজ, এই যে সন্ধে হয়ে এসেছে, রাজবাড়িতে ওই যে বন্দীরা দিনাবসানের গান ধরলে, এরও কি কোনো ডাক নেই ? যা কঠিন তার গৌরব থাকতে পারে, কিন্তু যা মধুর তারও মূল্য আছে।

অভিজিৎ। ভাই, তারই মূল্য দেবার জন্যেই কঠিন সাধনা।

সঞ্জয় । সকালে যে আসনে তুমি পূজায় বস, মনে আছে তো সেদিন তার সামনে একটি শ্বেত পদ্ম দেখে তুমি অবাক হয়েছিলে ? তুমি জাগবার আগেই কোন্ ভোরে ওই পদ্মটি লুকিয়ে কে তুলে এনেছে, জানতে দেয়নি সে কে - কিন্তু এইটুকুর মধ্যে কত সুধাই আছে সে কথা কি আজ মনে করবার নেই ? সেই ভীরু, যে আপনাকে গোপন করেছে, কিন্তু আপনার পূজা গোপন করতে পারে নি, তার মুখ তোমার মনে পড়ছে না ?

অভিজিৎ। পড়ছে বই কি। সেই জন্যেই সইতে পারছি নে ওই বীভৎসটাকে যা এই ধরনীর সংগীত রোধ করে দিয়ে আকাশে লোহার দাঁত মেলে অট্টহাস্য

করছে। স্বর্গকে ভালো লেগেছে বলেই দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে যেতে দ্বিধা করি নে।

সঞ্জয়। গোধূলির আলোটি ওই নীল পাহাড়ের উপরে মূর্ছিত হয়ে রয়েছে এর মধ্যে দিয়ে একটা কান্নার মূর্তি তোমার হৃদয়ে এসে পৌঁছচ্ছে না ?

অভিজিৎ। হাঁ, পৌঁছচ্ছে। আমারও বুক কান্নায় ভরে রয়েছে, আমি কঠোরতার অভিমান রাখিনে। - চেয়ে দেখো ওই পাখি দেবদারু-গাছের চূড়ায় ডালটির উপর একলা বসে আছে, ও কি নীড়ে যাবে, না, অন্ধকারের ভিতর দিয়ে দূর প্রবাসের অরণ্যে যাত্রা করবে জানি নে, কিন্তু ও যে এই সূর্যাস্তের আকাশের দিকে চুপ করে চেয়ে আছে সেই চেয়ে থাকার সুরটি আমার হৃদয়ে এসে বাজছে, সুন্দর এই পৃথিবী। যা কিছু আমার জীবনকে মধুময় করেছে সে সমস্ত কেই আজ আমি নমস্কার করি।

('মুক্তধারা')

৭) নন্দিনী । আমাকে তোমার কিসের দরকার।

অধ্যাপক । দরকারের কথা যদি বললে, ওই চেয়ে দেখো। আমাদের খোদাই-করের দল পৃথিবীর বুক চিরে দরকারের বোঝা মাথায় কীটের মতো সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে উপরে উঠে আসছে। এই যক্ষপুরে আমাদের যা কিছু ধন সব ওই ধুলোর নাড়ির ধন - সোনা। কিন্তু সুন্দরী, তুমি যে-সোনা সে তো ধুলোর নয়, সে-যে আলোর। দরকারের বাঁধনে তাকে কে বাঁধবে।

নন্দিনী । বারে বারে ওই একই কথা বল। আমাকে দেখে তোমার এত বিস্ময় কিসের অধ্যাপক।

অধ্যাপক । সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আর এক কথা। যক্ষপুরে

তুমি আচমকা আলো। তুমিই বা এখানকার কথা কী ভাবছ বলো দেখি।

নন্দিনী। অবাক হয়ে দেখছি, সমস্ত শহর মাটির তলাটার মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়ে অন্ধকার হাতড়ে বেড়াচ্ছে। পাতালে সুড়ঙ্গ খুদে তোমরা যক্ষের ধন বের করে আনছ। সে যে অনেক যুগের মরা ধন, পৃথিবী তাকে কবর দিয়ে রেখেছিল।

(রক্তকরবী)

পূর্বোক্ত নির্বাচিত উদ্ধৃতিগুলি অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিভাবনার পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি ভাবনার প্রথম কথা হলো, অন্যান্য সকল মহৎ কবির মতো রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে জীবনের সত্যকে বুঝতে বা জানতে চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতির বাহ্যিক রূপ বা সৌন্দর্য তাঁকে ক্ষনে ক্ষনে মুগ্ধ করেছে, তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্যকে সমস্ত হৃদয় ও অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন, এবং তাতে নিমগ্ন হয়েছেন। প্রকৃতির এই সৌন্দর্য তাঁর চোখে যে অঞ্জন পরিয়ে দিয়েছে, তার ফলে তাঁর সৌন্দর্যবোধ পরিপুষ্ট হয়েছে, একথা সহজেই অনুভব করা যায়। এক্ষেত্রে তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থের তথা রোমান্টিক কবিদের সমগোত্রীয় - যাঁরা প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা উপলব্ধি করেছেন। বস্তুত, সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে আমরা যে সৌন্দর্যের অফুরন্ত উৎসার দেখি, তার প্রায় সবটাই উঠে এসেছে প্রকৃতির অঙ্গন থেকে। প্রকৃতিই তাঁকে সৌন্দর্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রেরণা দিয়েছে।

দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির ভিতর দিয়ে বিশ্বজীবনের সত্যকেও বুঝতে চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতির বিচিত্র লীলার দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ জীবনের বৈচিত্র্যের স্বাদ পেয়েছেন। এবং চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা-পর্বত-কান্তার-মরু-বনানী সমন্বিত প্রকৃতির রূপ-রূপান্তরের

ভিতর দিয়ে অনুভব করেছেন যে, আকাশের গ্রহ নক্ষত্র থেকে সুরু করে সব কিছু আ আবর্তিত হয়ে চলেছে। এবং এই আবর্তন বা চলাই হচ্ছে বিশ্বজীবনের ছন্দ, বিশ্বলোকের মৌল সত্য। কবি লক্ষ্য করেছেন, ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতি একটা রূপ খসিয়ে অন্যরূপ ধারণ করে, ঋতুর এই পালাবদল রবীন্দ্রনাথের সত্যানুভবে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। প্রকৃতি যেমন প্রতি মুহূর্তে পুরাতন আবরণ খসিয়ে ফেলে নব নব রূপ ধারণ করে, তেমনি মানুষের জীবনও আবর্তিত হয়ে চলেছে নব নব রূপে, নব নব প্রাণে। পালাবদলের এই সত্য রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় নানাভাবে রূপায়িত হয়েছে। প্রকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা এইভাবেই তাঁকে মানব জীবনের ও বিশ্বজীবনের সত্যানুভবে নিবিড় ভাবে সাহায্য করেছে। অর্থাৎ বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের সত্যানুভবে প্রকৃতি প্রগাঢ় ভাবে রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছে।

রবীন্দ্রভাবনায় প্রকৃতি সম্পর্কে যে বোধ বিশেষভাবে প্রতীয়মান হয়েছে - তা হচ্ছে প্রকৃতির রহস্য-ময়তা ও বিস্ময়বোধ। প্রকৃতির বাহ্যিক রূপের আড়ালে লুকিয়ে আছে রহস্যময়ী প্রকৃতির আর এক রূপ, যে নিজেকে ধরা দেয় না, শুধু ইঙ্গিতে ডাক দেয়। একইভাবে, এই রহস্যময়তার সঙ্গে মিশে আছে বিস্ময়বোধ। প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথকে এই দুটি দিক থেকেই গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে। বলা যেতে পারে, 'ক্ষুধিত পাষাণের' নায়কের মতো রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতির রহস্যময়তার হাতছানিতে ঘুরে বেরিয়েছেন দিকে দিগন্তরে। লাস্যময়ী ইরাণী নর্তকীর মতো প্রকৃতি কবির চোখের সামনে এক অখন্ড বিস্ময়ের মোহজাল রচনা করে চকিতে অদৃশ্য হয়ে গেছে বারংবার। বস্তুত, সমগ্র রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে প্রকৃতির বিস্ময়মিশ্রিত রহস্যময়তা বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। বলাবাহুল্য, এক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের ইংরেজি লেক গোষ্ঠীর রোমান্টিক কবিদের মতোই প্রকৃতির মধ্যে জীবনের এক গূঢ়ার্থ অনুভব করেছেন। এইভাবেই রবীন্দ্রভাবনায় প্রকৃতি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

রবীন্দ্র-কাব্যের সূচনায় দেখতে পাই, এক আকস্মিক মুহূর্ত এক অনির্বচনীয় প্রভাতের সূর্যোদয়কে কেন্দ্র করে কবির নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। সেদিন প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিই কবির স্বপ্নভঙ্গ করেছেন, কবিকে বিশ্বজগতের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার কবির প্রার্থনা অন্য কিছুই নয়, শুধু তাঁর বাসনা-জগতকে দেখা। অতঃপর সেই বাসনাই কবিকে বারংবার প্রকৃতির কাছে নিয়ে গেছে - যার প্রতিফলন দেখতে পাই তাঁর সমগ্র রচনায়।

কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখা গেল - প্রকৃতি তাঁর কাছে রহস্যময়ীই থেকে গেল। প্রকৃতির ভিতর দিয়ে যে কবি জীবনকে ও জীবনের সত্যকে অনুভব করতে চেয়েছিলেন, সেই কবি শেষ পর্যন্ত বললেন - বিচিত্র ছলনাজালে ছলনাময়ী প্রকৃতির সৃষ্টির পথ আকীর্ণ করে রেখেছে। অর্থাৎ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতায় যে রহস্যবোধ ও বিস্ময়বোধ জেগেছিল কবির মনে - তার সমাধানে কবি পৌঁছোতে পারলেন না। তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসাই থেকে গেল - উত্তর মিলল না।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে কবির প্রথম অভিজ্ঞতা ও তার পরিণতিতে পৌঁছোবার পথে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন স্তরে প্রকৃতি সম্পর্কে ভেবেছেন। কীভাবে তাঁর প্রকৃতি-ভাবনা ক্রমোত্তরণের পথে অগ্রসর হয়েছে, সে বিষয়েই একটি স্বতন্ত্র গবেষনা হতে পারে। আপাতত শুধু বলা দরকার, ডঃ অমিয় সেন তাঁর 'প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বিশেষভাবে কাব্যের ভিতর দিয়ে এই ক্রমোত্তরণের রূপটি দেখাতে চেয়েছেন। তাঁর প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা গেল :

> " রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের সমগ্রতাকে উপভোগের সীমার মধ্যে ধরতে গেলে যে জিনিসটা আমাদের চোখে বড়ো হয়ে ওঠে সেটা হল সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির মূলে কবির জীবনে এক সৌন্দর্যময় ঐক্যানুভূতির পরিচয়। এই ঐক্যানুভূতির গভীরতায় সৃষ্টির সমস্ত খন্ড জিনিসের তুচ্ছতাকে তিনি এক অখন্ডতার সঙ্গে যুক্ত করে সার্থক করে

তুলেছেন, প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের মধ্যে একটি বৃহত্তর অর্থ আবিষ্কার করেছেন,"[১৬]

ড: সেন অত:পর রবীন্দ্রকাব্যের ক্রমোত্তরণের পথে কীভাবে কবির প্রকৃতিচেতনা উত্তরোত্তর বিকাশ লাভ করেছে, তার মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ করে বলেছেন :

" দীর্ঘ জীবন ধরে বিচিত্র ছন্দে, সপ্রভ ভাষায় কবি প্রকৃতি এবং জীবনের সৌন্দর্য ও রহস্যের রূপ দেবার প্রয়াস করেছেন, সে প্রয়াসের সফলতা তাঁকে অজস্র পুরস্কারও দিয়েছে। কিন্তু জীবনের শেষক্ষণে প্রকৃতির মধ্যে কবি যে নূতন রহস্য দেখতে পেলেন কবির ভাষা তার রূপ দিতে গিয়ে যেন থেমে গিয়েছে, প্রকাশরীতির অসীমতা তাঁকে পীড়া দিয়েছে।" [১৭]

এই সূত্রেই ড: সেন, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-ভাবনার স্বকীয়তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন :

" রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি প্রেমে ভারতীয় এবং পাশ্চাত্য আদর্শের মিলন ঘটেছিল একথা যত বড়ো সত্য, তার চেয়ে বড়ো সত্য তাঁর প্রকৃতি প্রেমের স্বকীয়তা। তাঁর কাব্য সাধনার এই দিক্‌টিতে আমরা পূর্ববর্তী অন্যান্য কবির প্রভাব সম্বন্ধে যত দীর্ঘ মন্তব্যই করি না কেন, এই সমস্ত প্রভাবের উপরে তাঁর নিজের বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। ভারতীয় দৃষ্টিভংগি এবং পাশ্চাত্ত্য উপভোগের রীতি শুধু তাঁর প্রকৃতি-প্রেমকে একটা বিশিষ্ট রূপ দিয়েছে। তাতে তাঁর দেখার মৌলিকত্ব বা উপলব্ধির স্বকীয়তা খর্ব হয়নি। এই দুটি ধারার সংমিশ্রণের পরিচয় বহন করেও তাঁর প্রকৃতিপ্রেম এ দুএরই চেয়ে ভিন্ন। এ ভিন্নতাটুকু লক্ষ্য না করলে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেমের স্বরূপটি বোঝা যাবে না।" [১৮]

---

১৬. প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ/ অমিয় কুমার সেন/ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়/ ৭ পৌষ ১৩৫৪/ পৃষ্ঠা - ১/ সূচনা

১৭. তদেব, পৃ.২২০

১৮. তদেব, পৃ.স.১৭

এ বিষয়ে আগেই আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছি যে রবীন্দ্রনাথ বহুলাংশে য়ুরোপীয় রোমান্টিক কবি-গোষ্ঠীর সমগোত্রীয়। ঠিকমতো বলতে গেলে, রোমান্টিকতার ধারণা আমরা য়ুরোপীয় কাব্য থেকেই পেয়েছি। যদিও ভারতীয় সাহিত্যে কালিদাস ও ভবভূতির কাব্যে রোমান্টিক ভাবনার সদৃশ্য অনেক দৃশ্য আছে, যদিও মেঘদূত কাব্যের কল্পনা চরম মাত্রায় যে কোন অর্থে রোমান্টিক, তবু একথা তো ঠিক উনিশ শতকের ইংরেজি সাহিত্য পাঠের ভিতর দিয়েই আমাদের লেখক ও কবি সমাজ রোমান্টিক মানসিকতা গড়ে তুলেছেন। সুতরাং আমাদের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্যে প্রকৃতি যেভাবেই বিধৃত হয়ে থাক না কেন, একালের সাহিত্য-সৃষ্টিতে তার পুনরাবির্ভাব প্রায় অসম্ভব। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-ভাবনায় যতোই ভারতীয় আদর্শ প্রভাব বিস্তার করুক না কেন, তা সর্বৈব ভারতীয় আদর্শের অনুকৃতি মাত্র নয়। আসলে, প্রকৃতিকে দেখার চোখ রবীন্দ্রনাথ তাঁর আপন অভিজ্ঞতা থেকেই লাভ করেছেন।

সুতরাং ডঃ সেন যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা পুরোপুরী মেনে নেওয়া অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের জীবন-ভাবনায় প্রকৃতির কী ভূমিকা ছিল, তা আমরা পূর্বোল্লিখিত রবীন্দ্ররচনার আংশিক উদ্ধৃতিগুলির ভিতর থেকে দেখতে পাই। জন্মসূত্রে, তিনি কলকাতায় জন্মেছিলেন, ফলে প্রকৃতিকে তিনি 'আড়াল আবডাল' থেকে দেখতেন এবং তার প্রতি আকর্ষন বোধ করতেন। এই রকম একটা প্রাকৃতিক মুহূর্তকেই কেন্দ্র করে তাঁর নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটেছিল। কিন্তু অবশেষে 'আড়াল-আবডাল' থেকে দেখা দূরের প্রকৃতিকে তিনি অত্যন্ত কাছের থেকে দেখার সুযোগ পেয়ে যান তাঁর উত্তরবঙ্গে থাকাকালীন জীবনযাপনের দিনগুলিতে। তখন আর প্রকৃতিকে 'আড়াল-আবডাল' থেকে দেখার দরকার হল না, তিনি প্রকৃতিকে পেলেন অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে, যার রেশ চলেছিল জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। তাঁর জীবনের শান্তিনিকেতন পর্বেও তিনি তেমনিই উদারভাবে প্রকৃতিকে কাছে পেয়েছিলেন, একথাও প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার।

কিন্তু প্রকৃতি সম্পর্কে কবির অনুভূতি তাঁর জীবনের এবং সেইসঙ্গে তাঁর কাব্যসৃষ্টির পর্বে পর্বে বিবর্তিত হয়ে চলেছিল, তা বোধ হয় না বললেও চলে। অর্থাৎ সহজভাবে বলতে গেলে, তাঁর জীবনের ও কাব্যের বিভিন্ন পর্বে প্রকৃতি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনা দানা বেঁধেছিল। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে এবিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু ধারাবাহিক আলোচনা করা গেল।

রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক পর্বের কাব্যধারায় রবীন্দ্রনাথের চোখে প্রকৃতি যে রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল, তাকে এক কথায় বলা যেতে পারে - তা হচ্ছে একধরণের শিশু সুলভ বিস্ময়। এখানে তিনি প্রকৃতির যে সব ছবি রচনা করেছেন, তাতে প্রকৃতির যেমন বাহ্যিক রূপ চিত্রিত, অন্যদিকে তেমনি তার ফাঁকে ফাঁকে একটা কৌতূহলী বিস্ময় ফুটে উঠেছে। 'বনফুল' থেকে শুরু করে 'সন্ধ্যাসংগীত', 'প্রভাতসংগীত', 'ছবি ও গান', 'কড়ি ও কোমল', পর্যন্ত কাব্যধারার এই হচ্ছে মূল কথা। তবে, সব কবিদের মতো, যেহেতু সব কবিই প্রথম জীবনে জীবনকে দেখেন রোমান্টিক অঞ্জন মাখিয়ে, ~~দিয়েছে~~, এমন কথা বলা বোধহয় অসঙ্গত হবে না। কোন কোন সমালোচক দেখিয়েছেন, এই পর্বের প্রকৃতি ভাবনায় য়ুরোপীয় রোমান্টিক কবিদের এবং তার পাশাপাশি বিশেষত বিহারীলালের প্রভাব আছে।[১৯]

প্রকৃতপক্ষে, যেমন সামগ্রিক রবীন্দ্রকাব্য ধারায় 'মানসীর' একটি বিশেষ ভূমিকা আছে, 'প্রবেশিকা' অতিক্রমণের ব্যাপারে, একইভাবে, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিচেতনাতেও দেখি - কবি 'মানসী'তে পৌঁছেই স্পষ্ট করে প্রকৃতিকে গভীরভাবে বোঝবার ও জানবার চেষ্টা করছেন। বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের কবি মানস প্রকৃতির মধ্যে বিচিত্র স্বাদ

---

১৯. অমিয় সেন, প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ

পেয়েছে : ব্যথা বেদনা আনন্দ নিষ্ঠুরতার বিচিত্র অভিব্যক্তি আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পারি এবং ঐ সবই প্রকৃতিকে কেন্দ্র ক'রে। এখানেও দেখি, কবি পুরোনো সংস্কৃত ও সাহিত্যের বিশেষত কালিদাসের কাব্যের অনুসঙ্গ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন, প্রকৃতি-সম্পর্কিত কবিতাগুলির বেশ কয়েকটির মধ্যে তার পরিচয় পাই। কিন্তু মানসী যেহেতু মূলত রোমান্টিক কাব্য, তাই শেষ পর্যন্ত কবির প্রকৃতি ভাবনায় ব্যথার আর্তিই বারংবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

এরই অনুরণন দেখি পরবর্তী কাব্য 'সোনারতরী'তে। এই কাব্যের স্থাপনাও প্রকৃতিকেই কেন্দ্র ক'রে অর্থাৎ প্রকৃতিই এই কাব্যের প্রেরণার মূল উৎস। বলা বাহুল্য, এই পর্বে কবির সমস্ত চিত্ত অধিকার ক'রে আছে পদ্মার পারিপার্শ্বিকতা। তাই, যে প্রকৃতিকে কবি গৌণ ভাবে তাঁর ভাবনায় পেয়েছিলেন, এখানে সেই প্রকৃতি নিয়েছে প্রত্যক্ষ ভূমিকা এবং সেই কারণেই কোন সমালোচক মন্তব্য করেছেন যে শুধুমাত্র প্রকৃতি বর্ণনায় নয়, প্রকৃতির প্রতি তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রেও 'সোনার তরী' কাব্যটি পূর্ণতম পরিণতির কাব্য।[২০]

বস্তুত, 'বিশ্বপ্রকৃতি' ও 'মানবলোকের' মধ্যে যোগসূত্র রচনাই এই কাব্যের প্রকৃতি ভাবনার মূল কথা ~~এবং এই কাব্যের প্রকৃতি ভাবনার মূল কথা~~ এবং এই কাব্যের প্রথম কবিতাটির মধ্যেই তার ইংগিত মেলে। মানসীতে কবি প্রকৃতিকে মাতৃরূপে দেখেছেন, দেখেছেন তার নিষ্ঠুর রূপটিও। কিন্তু এখানে প্রকৃতি তাঁর কাছে দরিদ্র রমনীর রূপে প্রতিভাত হয়েছে। 'দরিদ্রা' কবিতাটি তার প্রমাণ। কিন্তু লক্ষণীয়, এইসব আপাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুভূতিকে ছাড়িয়ে প্রকৃতিকে আশ্রয় ক'রে কবি যে শেষ পর্যন্ত অরূপানুভূতির দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, তা এই কাব্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বস্তুত, পরবর্তী কাব্যধারায়, 'চিত্রা থেকে গীতাঞ্জলি' পর্বের রচনায়, আমরা এরই উত্তরণ দেখি। এই অরূপানুভূতিকে যদি একধরণের

---

২০. অমিয়কুমার সেন, প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ

অতীন্দ্রিয় অনুভূতি বলা যায়, তাহলে বলতে হবে, তারও সূত্রপাত দেখতে পাই এই কাব্যে। বস্তুত, বলা যেতে পারে, কবির প্রকৃতিভাবনাকে আশ্রয় ক'রেই আস্তে আস্তে অরূপানুভূতি ও অতীন্দ্রিয়ানুভূতির সংস্কার ঘটেছে। অর্থাৎ যা ছিল মানবলোকের সংগে সম্পৃক্ত, সেই প্রকৃতি কবিকে ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অরূপের অদৃশ্য-লোকে নিয়ে চলেছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, সীমার মধ্যে অসীমের মিলনসাধনের যে পালার কথা বলেছেন কবি, প্রকৃতপক্ষে সেই অসীমের অনুভূতির যে রহস্যময়তা তার সম্ভাবনা এখান থেকেই সুরু হয়েছে, এমন বলা যেতে পারে। 'রাজা' নাটকের রাজা বা অরূপের যে পরিকল্পনা চোখে পড়ে, তার উৎস এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে বলে মনে হয়। আবার 'চিত্রার জীবনদেবতার উৎসও এই কাব্যেই পাই। এবং এসবই ঘটেছে - প্রকৃতিকে আশ্রয় করেই। অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যরচনার প্রাথমিক পর্ব অতিক্রম করার অব্যবহিত পরেই তাঁর অভীষ্ট-সম্পর্কে অবহিত হতে পেরেছেন এবং তা ঘটেছে প্রকৃতিকে আশ্রয় করেই। এক কথায় বলা যায়, প্রকৃতিই তাঁর সেই আশ্রয়স্থল - যে আশ্রয়ে তাঁর কবি মানসের সার্বিক বিকাশ ঘটেছে। সীমা অথবা অসীম, মানবলোক থেকে অরূপলোক, যাই হোক না কেন, প্রকৃতিই কবিকে সেইসব ক্ষেত্রে পৌঁছে দিয়েছে। ওয়ার্ডসওয়াথের মতো রবীন্দ্রনাথও মূলত প্রকৃতির ভিতর দিয়েই জীবনের মৌলিক অনুভূতিগুলি এবং জীবনের ধ্রুব সত্যকে অনুভব করবার প্রয়াস পেয়েছেন।

পরবর্তী কাব্যধারায়, যেমন চিত্রা, কল্পনা, খেয়া, গীতাঞ্জলী, একটু আগেই বলেছি প্রকৃতি সম্পর্কিত এই ভাবনা গভীরতর রূপ পরিগ্রহ করেছে।

আমরা জানি, 'বলাকা' থেকে রবীন্দ্রকাব্যধারা বিশেষ এক পালাবদলের মুখোমুখি হয়েছে। সাধারণভাবে এই পালাবদল সম্পর্কে এইভাবে বলা যায় যে, এই পর্বে কবি পূর্ববর্তী মানসিকতা থেকে সরে এসে সহজ স্বচ্ছ দৃষ্টিতে জীবনকে দেখেছেন, তাঁর দৃষ্টিভংগী আগের তুলনায় অনেক পরিমাণে বাস্তবানুগ হয়েছে। যদিচ তিনি অনেক পরে ঘোষনা করেছেন

যে তিনি 'জন্মরোমান্টিক', তবু একথা বলা হয়ত অসঙ্গত হবে না যে, এই পর্বে কবি বারংবার মাটির আঘ্রান নেবার জন্য প্রাকৃত জীবনের দিকে মনোযোগী হয়েছেন।

এবং একইভাবে, রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনায় প্রকৃতি-সম্পর্কে আগেকার ধারণার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এই পর্বে। 'বলাকা' থেকে সুরু করে 'শেষলেখা' পর্যন্ত কাব্য-ধারার দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে - আগের মতোই এখানেও কবি প্রকৃতির প্রতি ক্ষণে ক্ষণে আকৃষ্ট হয়েছেন,। কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে এই যে, প্রকৃতি এখানে কবির কাছে কোন অলংকৃত রূপে দেখা দেয়নি, দেখা দিয়েছে তার সহজ সরল স্বাভাবিক রূপ নিয়ে। 'গীতাঞ্জলি' -পরবর্তী অথবা বলাকা-উত্তর রবীন্দ্রকাব্যধারার প্রকৃতি-চেতনার এইটেই মূল কথা।

এই বক্তব্যটি উপস্থাপিত করতে গিয়ে এই কাব্যধারা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারতো। কিন্তু তেমন বিস্তারিত আলোচনার মধ্যে না গিয়েও উদ্দিষ্ট মন্তব্যের সারবত্তার প্রমাণ পাই 'পুনশ্চ' কাব্যের 'কোপাই', 'খোয়াই' শীর্ষক কবিতাগুলির মধ্যে। কবি তাঁর রোমান্টিক নির্মোহ ছেড়ে কীভাবে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে প্রকৃতিকে দেখছেন এবং প্রকৃতির কোন্ স্বাদ গ্রহণ করছেন, তার পরিচয় নিহিত আছে বিশেষ ভাবে 'পুনশ্চ' কাব্যে। লক্ষ করা যেতে পারে, কবি প্রকৃতির মধ্যে কোন আরোপিত রূপকে পরিগ্রহ করছেন না, 'যেমন আছো তেমনি এসোর' মতো দৃষ্টি মেলে তিনি প্রকৃতি-র দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ফলত, আমরা দেখতে পাই - প্রকৃতির অলংকৃত কোন ছবি নয়, কোন মহৎ উজ্জ্বল ছবি নয়, বরং তার বিপরীত - অসংস্কৃত অবহেলিত সামান্য ও তুচ্ছ ছবিটিই কবির অভিপ্রেত হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের পূর্বতন কাব্যধারায় প্রকৃতিভাবনা থেকে এই পর্বের প্রকৃতি-ভাবনা ভিন্ন পথ নিয়েছে। আগেই বলেছি যে, রবীন্দ্রনাথ এই পর্বে উত্তরোত্তর প্রাকৃত বা মাটির কাছাকাছি জীবনের দিকে ক্রমাগত মগ্ন হয়েছেন। তার সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত - শেষ বেলাকার মৃত্তিকা-নির্মিত গৃহ 'শ্যামলী'তে কবির বসবাসের দিনগুলি। বস্তুত, এই যে প্রকৃতির স্বাভাবিক রূপটি দেখার জন্য ব্যাকুলতা ও আগ্রহ, তার পরিচয় এই পর্বের কাব্যধারায় বারংবার দেখতে পাই।

তবু যেন বিশেষভাবে 'বনবাণী'র কথা উল্লেখ করতেই হয়। বনবাণীর ভূমিকায় কবি বলেছেন -

"আমার ঘরের আশেপাশে যেসব আমার বোবা-বন্ধু আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছল। তাদের ভাষা হচ্ছে - জীবজগতের আদিভাষা, তার ইশারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমতম স্তরে, হাজার হাজার বৎসরের ভুলে-যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়, মনের মধ্যে যে-সাড়া ওঠে সেও ওই গাছের ভাষায়, - তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগযুগান্তর গুনগুনিয়ে ওঠে।

ওই গাছগুলো বিশ্ব বাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে বিরাট প্রাণসমুদ্রের কূলে, যে-সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীরতলে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। 'এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাণি' দেখি ফুলে ফলে পল্লবে; তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি।"

কবির মন্তব্যের মধ্যে আমাদের পূর্বোক্ত বক্তব্যের প্রমাণ পাই। কবি এতকাল প্রকৃতির মহৎ এবং অনির্বচনীয় ছবিগুলি এঁকেছেন, প্রকৃতিকে দেখেছেন দূর থেকে - অসীম আকাশে খচিত অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র থেকে শুরু করে পাহাড়-পর্বত-নদী-সমুদ্রের স্বাদ নিয়েছেন। কিন্তু আজ ? আজ আর সেদিকে দৃষ্টি নেই কবির। তাঁর চারপাশে যে অনাদৃত অবহেলিত প্রকৃতি - তার সহজ সরল রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কবির দৃষ্টি সেদিকে। সমগ্র 'বনবাণী' কাব্য তারই আলোচ্য। তবু বিশেষভাবে এই কাব্যের আম্রবন, নীলমণিলতা,

কুরচি, শাল ও মধুমঞ্জরি - এই কবিতাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। কবিতাগুলির সূচনায় কবি এক একটি ভূমিকা সংযোজন করেছেন গদ্যে। তার ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য তুলে ধরেছেন। যেমন, 'কুরচি' কবিতায় ভূমিকায় কবি বলছেন,

> "অনেককাল পূর্বে শিলাইদহ থেকে কলকাতায় আসছিলেম। কুষ্টিয়া স্টেশনঘরের পিছনের দেয়ালঘেঁষা এক কুরচি গাছ চোখে পড়ল। সমস্ত গাছটি ফুলের ঐশ্বর্যে মহিমান্বিত। চারিদিকে হাটবাজার, একদিকে রেলের লাইন, অন্যদিকে গোরুর গাড়ির ভিড়, বাতাস ধুলোয় নিবিড়। এমন অজায়গায় পি·ডব্লু·ডি-র সুরচিত প্রাচীরের গায়ে ঠেস দিয়ে এই একটি কুরচি গাছ তার সমস্ত শক্তিতে বসন্তের জয় ঘোষনা করছে - উপেক্ষিত বসন্তের প্রতি তার অভিবাদন সমস্ত হট্টগোলের উপরে যাতে ছাড়িয়ে ওঠে এই যেন তার প্রানপণ চেষ্টা। কুরচির সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়।"

কুরচির মতো উপেক্ষিত অথবা অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত ফুলের প্রতি কবির যে বন্দনা, তা এই কবিতায় বিধৃত। একইভাবে, 'মধুমঞ্জরি' কবিতায় কবি বলেছেন,

> "এ লতার কোনো একটা বিদেশী নাম নিশ্চয় আছে - জানিনে, জানার দরকারও নেই। আমাদের দেশের মন্দিরে এই লতার ফুলের ব্যবহার চলে না, কিন্তু মন্দিরের বাহিরের যে দেবতা মুক্তস্বরূপে আছেন তাঁর প্রচুর প্রসন্নতা এর মধ্যে বিকশিত। কাব্যসরস্বতী কোনো মন্দিরের বন্দিনী দেবতা নন, তাঁর ব্যবহারে এই ফুলকে লাগাব ঠিক করেছি, তাই নতুন করে নাম দিতে হল। রূপে রসে এর মধ্যে বিদেশী কিছুই নেই, এদেশের হাওয়ায় মাটিতে এর একটুও বিতৃষ্ণা দেখা যায় না, তাই দিশী নামে একে আপন করে নিলেম।"

এখানেও দেখি, একটি অনাদৃত ফুলকে স্বীকৃতি দেবার বাসনায় কবি কী গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছেন নামগোত্রহীন এমন একটি ফুলের দিকে। এই মানসিকতার উৎসার এই কাব্যের সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়।

বলাবাহুল্য, প্রকৃতিকে এইভাবে দেখার মধ্যে একটা গভীর আনন্দবোধ কাজ করেছে। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন,

> "এই 'বনবাণী' সংগ্রহের প্রত্যেকটি কবিতায় (প্রত্যেকটি কবিতায় ... সূচনা কোরছে) এই কথাই প্রকাশ পাচ্ছে যে কবি বৃক্ষলোকের মধ্যে যে প্রাণরস প্রবাহিত হোচ্ছে তার সঙ্গে নিজের প্রাণরসের ঐক্য অনুভব কোরে এবং এই বৃক্ষলোকের মধ্য দিয়ে যে অনাদি প্রাণলোক এই পৃথিবীকে রসে ও আনন্দে অভিসিক্ত কোরছে - তা স্পষ্ট কোরে অনুভব কোরতে পারতেন। সে আনন্দ এই সংগ্রহের প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে যেন দ্রাক্ষারস পানের মত্ততার সূচনা কোরছে।" (সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত / রবি-দীপিতা / মিত্র ও ঘোষ / ৩য় সংস্করণ পৃ: - ১৭৭-১৭৮)

কিন্তু, একেবারে অন্তিমপর্বে পৌঁছে দেখা যায়, কবি শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির রহস্য উন্মোচনে ব্যর্থ, আর সেই জন্যেই, তিনি যেন নিতান্ত অসহায় ভাবে ঘোষনা করছেন :

"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।
...

সন্দেহ নেই, কবির প্রকৃতি-ভাবনার এইটেই অন্তিম পরিণতি। কিন্তু কবির এই অনুভূতি- নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। কেননা, প্রাচীন ঋষিদের মতো, তিনিও তো একদিন প্রকৃতির স্বরূপ দেখতে চেয়েছিলেন, তার স্বরূপ উন্মোচন করতে চেয়েছিলেন। 'সোনারতরী' কাব্যের সেই অবগুন্ঠিতা রমণীর বেশে অথবা 'চিত্রা' কাব্যের বিচিত্র রূপিণী রমণীর বেশ ধরে জীবনদেবতা তাঁকে বিশ্বজীবন রহস্যের বেড়াজাল উন্মোচন করবার জন্য আগে যে আহ্বান জানিয়েছিল সেই আহ্বান আসলে প্রকৃতির অবগুন্ঠন উন্মোচনেরই আহ্বান। কবি সেই রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার জন্যে প্রকৃতিকে পর্বে পর্বে কতোরকম ভাবেই তো দেখলেন, কিন্তু পারলেন কি সেই রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে ?

পারলেন না। তাই এই দীর্ঘশ্বাস-মথিত শেষ কবিতার অবতারণা, তাই কবিকে বলতে হল :

মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বের করেছ চিহ্নিত,
তার তরে রাখ নি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরসূচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চিরসমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে যে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে -
সে পায় তোমার হাতে -
শান্তির অক্ষয় অধিকার॥

এইভাবেই, রবীন্দ্রনাথের জীবনভাবনায় প্রকৃতি শেষ পর্যন্ত কবির কাছে রহস্যময়ী ও ছলনাময়ী রূপেই বিধৃত রয়ে গেল ॥

<u>উল্লেখপঞ্জী</u>

১। রবীন্দ্ররচনাবলী জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ

২। প্রকৃতির কবি - অমিয় কুমার সেন

৩। রবি-দীপিতা - সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত